দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

রমাপদ চৌধুরী

আডেনির
২৩৮বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৯

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৪

প্রকাশক
অমলেন্দু চক্রবর্তী
অ্যাডেনির
২৩৮বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৯

মুদ্রক
শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

দাম : টাকা ৩'৫০

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

লালবাঈ

দরবারী

প্রথম প্রহর

আপন প্রিয়

পিয়াপসন্দ

অরণ্য আদিম

সমুদ্রে বুঝি অনেক শান্তি। সমুদ্রে আছে স্বাধীনতা।

মানুষের জীবনও হয়তো এমনই সমুদ্র আর দ্বীপে আনা-গোনা। মুক্তির আনন্দে হাঁপিয়ে ওঠে মানুষ। বিশাল জনতার ভেতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়ে নিতে চায়। দেশ আর সমাজের, লোভ আর মমতার ছোট ছোট দ্বীপ গড়ে নেয়। মুক্তি থেকে ফিরে পেতে চায় অসীম বন্ধন। তারপর একদিন সেই দ্বীপ মনে হয় অসহ্য জীবন। ঘরের প্রাচীর ভেঙে সমুদ্রের, জীবনের মুক্তি পেতে চায়।

শুধু এই আনাগোনা, দ্বীপ থেকে সমুদ্রে, আর সমুদ্র ছেড়ে দ্বীপে ফিরে আসা।

ছোট এই টিয়ারড দ্বীপ। কেউ আসে সম্পদের লোভে, কেউ পথ ভুলে, কেউ শুধু সুখশান্তির প্রেমময় নীড় খুঁজে খুঁজে। তারপর একদিন ফিরে যেতে হয়, সমুদ্রের ডাকে। ভুল পথ ভুলে গিয়ে, স্বপ্ননীড় ভেঙে দিয়ে, আরো কিছু সম্পদের লোভে। মুক্তির নেশায় তারা দ্বীপের আকাশে দেখে মৃত্যুর ইশারা।

মনে ভাবে, সমুদ্রে বুঝি অনেক শান্তি, সমুদ্রে আছে স্বাধীনতা। জীবনের সমুদ্রেও আছে এমনই এক বিচিত্র উন্মাদনা। তবু সে-মুক্তির আনন্দে হাঁপিয়ে ওঠে মানুষ, অসহ্য মনে হয় অসীম সাগর। তাই ফের ফিরে পেতে চায় মায়া আর মমতার, সংসারের দ্বীপ। ফিরে আসে। নীল ঢেউ এসে দেখে দ্বীপ তার বোবা হয়ে গেছে।

টিয়ার পালকের মতো ছোট্ট একটু সবুজের দ্বীপ। দ্বীপ সত্যিই। বঙ্গোপসাগরের ওপরে নুড়ি পাথরের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। মাতলা, রায়মঙ্গল, কাঙ্গা নদীর মোহানায়, হরিণঘাটা, তেঁতুলিয়া, হাতীয়া নদীর সাগর-সঙ্গমে যে ছোট ছোট দ্বীপের সারি নামহীন ভাবে মানচিত্রের গায়ে চিহ্নিত হয়ে আছে তা ছাড়াও আরো অনেক ছোট ছোট দ্বীপ সমুদ্র উপকূলের তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রতিহত করে টিকে আছে। জনবিজন এই দ্বীপগুলির খবর রাখে না কেউ। দ্বীপ বলে এগুলিকে যেন স্বীকার করাও চলে না, এত ক্ষুদ্র।

মাতালি, রোদপোয়া, টিয়ারঙ এমনি সব বিচিত্র নামকরণ এই সমুদ্রে ভাসা এক মাইল দেড় মাইল দৈর্ঘ্যপ্রস্থের মৃত্তিকাশ্রেণীর। মানচিত্রে বা সরকারী নথিপত্রে এ নামের সন্ধান মেলে না, তবু স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তা সার্থকনামা। মাতাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে প্রতিমুহূর্তে, তাই হয়তো দ্বীপের নাম মাতালি। সমুদ্রের ওপর পিঠ ভাসিয়ে রোদ পোয়ায় রোদপোয়া। আর টিয়ারঙ যেন টিয়াপাখির খসে পড়া পালক। সমস্ত দ্বীপ যেন সবুজের বন্যা। সবুজের বন্যায় বুনো গাছের চূড়া ছেয়ে যায় ফাল্গুনের রক্ত লাল ফুলে ফলে। সবুজ টিয়ার লাল ঠোঁটের মতো দেখায় তখন। তাই হয়তো দ্বীপের নাম টিয়ারঙ।

টিয়ারঙ দ্বীপে এখন হয়তো আবার সেগুনের কুঠি বসেছে। চাষী-মজুরের ভিড় জমেছে আবার।

স্টিফেন্স সাহেবের স্টীমার প্রথম যেদিন টিয়ারঙে এসে নোঙর ফেলেছিল সেদিন এই দেড় মাইল চওড়া আড়াই মাইল দীর্ঘ চরের যে পঁচিশ তিরিশ ঘর বাসিন্দে ছিল, সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে মাছ ধরত তারা, চাষ করত মেয়েরা, উদ্বৃত্ত ফসল আর শুঁটকী মাছ বেচে

আসত সন্দীপের হাটে।

স্টিফেন্স সাহেব চাকরি করতেন হ্যামিল্টন কোম্পানির জমিদারীতে। বাঁ হাতে চাকরি এবং ডান হাতে ব্যবসা করতে করতে হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে উঠলেন। চাকরি ছেড়ে কাঠের ব্যবসা জাঁকিয়ে বসলেন সারা সুন্দর-বনের দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে।

এই কাঠের খোঁজেই স্টিফেন্স সাহেবের স্টীমার এসে নোঙর ফেলেছিল টিয়ারঙে।

ছোট্ট দ্বীপ টিয়ারঙ। সমুদ্রের ঢেউ এসে পড়ছে তীরের ওপর। অবিরাম তরঙ্গের আঘাতে এতটুকু একটা দ্বীপ কি করে যে টিকে রয়েছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তবু বছরের পর বছর রোদে ঝলমল করে ওঠে টিয়ারঙের সবুজ বন, রক্তলাল শাল পলাশ, বুনো গাছের ফুল।

মাত্র পঁচিশ তিরিশ ঘর বাসিন্দে টিয়ারঙের। গায়ের রঙ তাদের ফরসা, একটু হয়তো বা হলুদ আর লালের আভা। কিন্তু চমৎকার স্বাস্থ্য প্রত্যেকটি মেয়েপুরুষের। দেহের গড়নে, মুখের ভাষায় উপজাতিসুলভ।

শোনা যায়, পর্তুগীজ হার্মাদ দস্যুর দল যখন বাংলায় আর উড়িষ্যায় লুঠতরাজ ডাকাতি করে বেড়াত সে-সময় আর-পাঁচটা দ্বীপের মতোই এই টিয়ারঙও ছিল তাদের আশ্রয়স্থল। আওরঙজেবের আমলে শায়েস্তা খাঁ বাংলার সীমান্ত থেকে হার্মাদদের নির্মূল করার পর কিছু-সংখ্যক পর্তুগীজ এখানে এসে বসবাস শুরু করে। মগধাওনির পর কয়েকটি মগ পরিবারও এখানে পালিয়ে আসে। তারপর মগ, পর্তুগীজ ও টিয়ারঙের আদিম অধিবাসীদের রক্ত-সংমিশ্রণে যে জাত গড়ে ওঠে তাদের অনেকেই দূরে দূরে অন্নসংস্থানের আশায় সরে গেলেও পঁচিশ

তিরিশটি পরিবার রয়ে গেল এই টিয়ারঙে।

এদের সুন্দর স্বাস্থ্য এবং সুন্দর চেহারার কারণও বোধহয় এইটুকুই।

সব কটি পরিবারই ডিঙি নৌকোয় মাছ ধরে, জমি চষে, স্বভাবজ নারকেল পাতার ছাউনি বুনে ঘর বানায়, ঝুনো নারকেল আর নারকেল ছোবড়ার দড়ি বিক্রি করে আসে দূর দূর গঞ্জে।

এমনিভাবেই দিন কেটে যায় এদের। পৃথিবীর কোথায় কি-হল না-হল খবর রাখে না।

প্রত্যেকটি পরিবারের মেয়েপুরুষ ছেলেপিলের নাম যদিও বাঙালীদের মতোই, ভাষাও বিকৃত বাংলা, কিন্তু পদবীগুলো অদ্ভুত। বোধহয় মগ এবং পর্তুগীজ পদবীর অপভ্রংশ কিংবা উপজাতীয়।

কয়েক ঘর মুসলমানও আছে এদের মধ্যে। অর্থাৎ নাম দেখে বোঝা যায় তারা মুসলমান। নাম ছাড়া আর সব দিক থেকেই তারা এক জাতি। আচার-বিচার সকলেরই এক। বিয়েও হয় পরস্পরের মধ্যে, কোনো বাছবিচার না রেখেই। কারণ, সভ্যজগতে বিয়ে বলতে যা বোঝায় এখানে তা কোনোদিন হয়েছে কিনা সন্দেহ।

পরিবেশটা যতখানি ছন্নছাড়া, জীবনধারণের পথ যত বন্ধুর, মানুষ-গুলোও তেমনি রুক্ষ আর রূঢ়। যদিও এমনিতে বড়ো ঠাণ্ডা, শান্তিপ্রিয়, কিন্তু যৌবনের গরম রক্ত যখন কোনো মেয়ের দিকে লোভের দৃষ্টি দেয় তখন তাকে বাহুবলে কেড়ে আনতে যেমন নীতিতে বাধে না, তেমনি মন দেওয়া পুরুষের প্রতি অন্য মেয়ের দৃষ্টি পড়লে চকচকে খুনিয়া বের করে তার পেটে বসিয়ে দিতেও পিছপাও নয় টিয়ারঙের প্রেমিকার জাত।

'খুনিয়া' অস্ত্রটা দেখলেই বোঝা যায় পর্তুগীজ এবং মগ দস্যুদের

রক্ত বইছে এদের শিরায় উপশিরায়। একটা সামুদ্রিক মাছের মাথার ওপরকার ছুঁচলো এবং গোল করাতের মতো 'খুনিয়া' দিয়ে এরা ধান কাটে, মানুষ খুন করে। কাস্তের মতো এতখানি গোল নয়, কিন্তু করাতের মতোই কাটা কাটা দাঁত আছে তার ভিতরে বাইরে— ছদিকেই। অর্থাৎ কাস্তের ডগাটা যদি ছুঁচলো হয় এবং তার ছপাশেই যদি ধারাল দাঁত থাকে তা হলেই 'খুনিয়া'র চেহারাটা বোঝা যাবে।

হাঁড়ি কলসী রাখার বিঁড়ের মতো চ্যাপটা খোঁপা মেয়েদের মাথার ওপর, তার ওপর গোল চিরুনির মত বসানো থাকে এই খুনিয়া।

গরীব সকলেই, খেটেখুটে দিন গুজরান হয়। তবু ছচার ঘর আছে যাদের বংশগৌরব কম নয়। জাতের মাহাত্ম্য আর বংশের গর্ব যেমন সর্বত্রই জনশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়, এখানেও তাই।

ফিরুজা বন্নুরা বলে, কোনো এক নবাব নাকি তার মেয়েদের নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বাংলা দেশ থেকে। তারপর ডাকাতের হাতে তারা সকলেই প্রাণ দিয়েছিল, শুধু পালিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। সেই মেয়েরই বংশধর তারা।

শুনে মনে হতে পারে শাহ সুজা যখন আওরঙজেবের ভয়ে পালিয়ে এসেছিলেন মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে, এবং সুজার শেষ জীবনের সঠিক খবর যখন জানা যায়নি, তখন তাঁর কোনো এক মেয়ে হয়তো এ-দ্বীপে পালিয়ে এসেছিল। এ পর্যন্ত ভাবা যেতে পারে, বিশ্বাস করা যায় না। কারণ ফিরুজাদের কেউই জানে না শাহ সুজা বলে কেউ কখনো ছিল কিনা। যেমন সে নিজেই জানে না যে তার নামটা ফিরোজা বান্নুর অপভ্রংশ।

এ সব জানবার বাসনাও নেই দ্বীপের লোকগুলির। বাইরের

পৃথিবীর সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক তা শুধু জন কয়েক পুরুষের, যারা নৌকো বোঝাই করে নারকেল এবং শুঁটকি মাছ নিয়ে গিয়ে বেচে আসত দু-মাসে ছ-মাসে একবার। ফেরার পথে কিনে আনত দুচারটে জরুরী তৈজসপত্র।

তাই টিয়ারঙের তীর ঘেঁষে যেদিন প্রথম একখানা স্টীমার এল, সবাই অবাক চোখ মেলে দেখতে দেখতে ছুটে গেল। পঁচিশ তিরিশটি পরিবারের একটি লোকও বাকী রইল না। সকলেই সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্টীমারের দিকে তাকিয়ে।

এত বড়ো নৌকো তারা কখনো দেখেনি। শুধু যারা গঞ্জে যেত তারাই বললে, এর নাম ইস্টিমার, দাঁড় টানতে লাগে না, কলের নৌকা এটা।

প্রথমবারে স্টীমার এসে তীরে ভিড়তে পারল না।

দুখানা ডিঙি নৌকো নামিয়ে দেওয়া হল স্টীমারের গা থেকে। আর সেই ডিঙি দুটো এসে ভিড়ল তীরে।

জন সাতেক লোক নেমে এল। একজন সাহেব। হাতে বন্দুক, মাথায় শোলা হ্যাট, পরনে কোটপ্যাণ্ট। আর দুজন সাহেবী পোষাকে বাঙালী।

বুড়ো মাধো কোলাসো দু-দুবার চট্টগ্রামে গিয়েছে মাল বেচে ফিরে আসার সময়। টিয়ারঙের লোকদের কাছে সে শুধু বৃদ্ধ নয়, জ্ঞানবৃদ্ধ।

তাই ফিরুজা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অবাক অবাক চোখ চেয়ে নবাগতদের দেখতে দেখতে জিগ্যেস করলে, কে ওই মানুষগুলান? ঠগী নয় তো ওরা?

নিজের অজান্তে হাতটা তার খোঁপায় গিয়ে ঠেকেছে। অর্থাৎ খুনিয়া ঠিক আছে কিনা।

মাধো কোলাসোও ভয় পেয়েছিল। তবু এতগুলো লোকের সামনে ভয়টা চাপা না দিয়ে উপায় নেই।

তাই তাচ্ছিল্যের ভাবে সে বললে, কালেট্যার সাহেব হবে। গোরা সাহেব।

অর্থাৎ কালেক্টর সাহেব।

মাধো কোলাসোর দোষ নেই। তার ধারণা, গোরা সাহেব মাত্রেই কালেক্টর।

মিস্টার স্টিফেন্স ততক্ষণে লোকগুলোর মুখের ওপর একচক্র চোখ ছুটো বুলিয়ে নিয়ে মাধো কোলাসোকে বেছে নিয়েছে সবচেয়ে বুড়ো দেখে।

এবার ছু-হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে মাধোকে জড়িয়ে ধরল সে। মাধো বুঝল, সাহেব তাদের কোনো ক্ষতি করতে আসেনি। হঠাৎ সেও এক বুক দাড়ির ফাঁকে হেসে উঠল খল খল করে, তারপর ছু-হাতে চেপে ধরল সাহেবের চওড়া পিঠটা।

অন্য লোকগুলো তখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। তন্ন তন্ন করে যেন যাচাই করে দেখছে নতুন লোকগুলোকে।

মাধোকে হাসতে দেখে ফিকজার ভয় কেটে গেল। হয়তো খানিকটা কৌতূহল, হয়তো বা আর সকলকে তার সাহসের প্রমাণ দেখাবার জন্যেই সেও হাসিহাসি মুখে এগিয়ে এল সাহেবের কাছে।

বন্দুকের গায়ে নরম করে হাত বুলিয়ে সপ্রশ্ন চোখ তুলে বললে, এটা কি হবে গা গোরা?

ফিরে তাকাল স্টিফেন্স। ফিরে তাকিয়েই মুগ্ধ হল। এমন স্বাস্থ্য, এমন রূপ এই জংলা দ্বীপে?

বাঁশ দিয়ে বানানো হাত-তাঁতে বোনা লাল-কালোর নক্সা-কাটা ঘাগরা, পরিপূর্ণ বুকে হলুদ রঙের কাঁচুলি, তার ওপর একটা শাদা গামছার মত ওড়না জড়ানো।

সাহেবকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পেল ফিরুজা। তবু কৌতূহল গেল না।

বললে, এটা কি বটে গা গোরা সাহেব?

প্রশ্ন শুনে হো হো করে হেসে উঠল স্টিফেন্স। তারপর বন্দুকটা তুলে উড়ন্ত এক ঝাঁক পাখির দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

গুলির শব্দে চমকে উঠল সকলে। ভয়ে মাধোকে জড়িয়ে ধরল ফিরুজা।

পরক্ষণেই দেখলে একটা পাখি টাল খেতে খেতে দলছাড়া হয়ে নীচে এসে পড়ল।

ছুটে গিয়ে সবাই দেখলে রক্তাক্ত পাখিটা মরে গেছে।

খলখল করে শব্দ করে মেয়েপুরুষ সবাই হেসে উঠল সাহেবের কৃতিত্বে।

আর চ্যাটার্জি বললে, ইউ হ্যাভ ওঅ্যান দি ফার্স্ট রাউণ্ড।

সত্যিই তাই। দ্বীপের লোকগুলো বন্ধু হয়ে গেল এই একটি ঘটনায়। যুদ্ধের প্রথম দফায় জয় হল স্টিফেন্সের। লোকগুলোর মনে যেটুকু অবিশ্বাস ছিল মুছে গেল। যেটুকু ভয় ছিল আরো বেড়ে গেল।

খুনিয়ায় হাত দেওয়ার যে কোনো দাম নেই বুঝতে পেরেই যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল সব রক্ত। যার হাতে এমন অদ্ভুত অস্ত্র তাকে বন্ধু মনে করা ছাড়া উপায় কি!

স্টিফেন্সের দল এবার চলল টিয়ারঙের বনে। পিছনে পিছনে দ্বীপের মেয়েপুরুষ।

গোরাটা কেন এসেছে তা কেউই বুঝতে পারে না।

তারা শুধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। দেখলে বনের গাছগুলো পরীক্ষা করে দেখছে স্টিফেন্স। কি যেন বলা কওয়া করছে নিজেদের মধ্যে।

সারাটা দিন ঘোরাঘুরি করে টিফিন ক্যারিয়ারে নিয়ে আসা খাবার খেয়ে তীরের দিকে ফিরে এল স্টিফেন্সের দল।

বাচ্চাগুলোকে লজেন্স বিস্কুট দিয়ে, মেয়েদের কাচের জলচুড়ি পরিয়ে, জোয়ানদের দিকে মুঠো মুঠো পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে ডিঙিতে করে স্টীমারে ফিরে গেল তারা।

খুশি খুশি মুখে সকলে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ স্টীমারটা দেখা গেল।

তারপর স্টীমার অদৃশ্য হতে ফিরুজা অস্ফুটে বললে, গোরাটা বড়ো ভালো মানুষ বটে।

দুই

সাহেবের দল এসেছিল। সাহেবের দল চলে গেছে। কিন্তু টিয়ারঙের মনে রোমাঞ্চ বুনে দিয়ে গেছে তারা। আগেকার মতোই চাষ করে মাছ ধরে দিন কাটে, অন্নসংস্থান হয়। কিন্তু থেকে থেকে স্মৃতির তারে কোথায় যেন মিষ্টি একটা সুর বেজে ওঠে।

টিয়ারঙের সবাই মনে মনে চায়, গোরার দল আবার ফিরে আসুক।

মেয়েরা কাচের জলচুড়িগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, গঞ্জে যাওয়ার সময় পুরুষদের কাছে বায়না ধরে, এমনি চুড়ি এনে দিতে হবে তাদের।

পুরুষগুলো হাসে। এত শৌখিন হলে আর ভাত জুটবে না তাদের। একজোড়া চুড়ির পয়সায় এক কুঞ্চি চাল পাওয়া যায়।

পুরুষগুলোও অবশ্য চায় গোরার দল ফিরে আসুক। এক ডিঙি শুঁটকি বেচে যে পয়সা পায় তারা, গঞ্জে ততগুলো পয়সা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে গোরার দল। লুটোপুটি করে কুড়িয়ে নিয়েছে তারা। এমনভাবে যারা পয়সা ছড়াতে পারে না জানি তাদের কত পয়সাই আছে।

কুড়ুল কাঁধে নিয়ে বনের ভেতর থেকে জ্বালানি যোগাড় করে আনতে যায় পুরুষগুলো, মেয়েগুলো কাঠ-পাতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসে। আর সেই ফাঁকে হেলেদুলে হাসতে হাসতে হঠাৎ এক একসময় আনমনা হয়ে যায়।

বালির ওপর তাদের পায়ের শব্দ হতেই ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁকড়াগুলো দল পাকিয়ে ছুটে পালায়। সেদিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে মেয়েগুলো।

বাতাসের গায়ে সে-হাসি ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, অনেকটা

পাহাড়ের গায়ে-লাগা প্রতিধ্বনির মতো। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকায় তারা, পায়ের গতি থেমে যায় আপনা থেকেই।

মনে হয় সমুদ্রের মধ্যে থেকে কারা যেন হেসে উঠল।

উদাস সরল দৃষ্টি মেলে দেয় ফিরুজাও। অনিমেষ চেয়ে থাকে, যেখানে একদিন গোরা সাহেবের ইস্টিমার এসে থেমেছিল।

—থামলি কেন রে ফিরুজা? পিছন থেকে পুরুষকণ্ঠে কে যেন ঠাট্টা করে বলে, লাগর তোর আসবে না রে, আসবে না।

ফিরুজা সশব্দে হেসে উঠে বলে, না আসুক। মন হয় তো পান্‌সি নিয়া চলে যাব লাগরের কাছে বরাবর।

বলেই বালিতে এক পা গেঁথে দিয়ে থেমে পড়ে। তরতর করে সঙ্গীসাথী সবাই এগিয়ে যায়।

মদ্‌না এসে পাশে দাঁড়ায়।

জোয়ান চেহারা, খালি গায়ে লম্বাচ অঙ্গ। মাথায় একরাশ ঝাঁপানো কটা কটা চুল।

রসিকতা করে পুরুষ্টু কাঁধের একটা ধাক্কা দেয় মদনা। সঙ্গে সঙ্গে ফিরুজার মাথার বোঝাটা পাশে বালির ওপর ঝুপ করে পড়ে যায়।

দুজন একই সঙ্গে সশব্দে হেসে উঠে একই সঙ্গে বালিতে পা ফসকিয়ে ধুপ করে বসে পড়ে।

মেঘ-ঢাকা রোদের তাপ নেই তখন, কিন্তু আলো আছে। বেশ একটা টকটকে রক্তের মতো লাল আলো।

সবল একখানা হাত আলতো ভাবে ফিরুজার ঘাড়ের ওপর এলিয়ে দিয়ে ঘন হয়ে বসে মদ্‌না।

তারপর ফিরুজার চোখে চোখ রেখে বলে, সাঙা করবি কিনা

বল্ ফিরুজা। বে-মন হস্ তো আগেভাগে বলে দে।

হাসিটা হঠাৎ কেমন দপ্ করে নিভে যায় ফিরুজার। মাথা নীচু করে চুপ করে বসে থাকে, একটা কাঠি হাতে নিয়ে আনমনে কি যেন আঁকে বালির ওপর।

একসময় ধীরে ধীরে বলে, বড়ো ভয় লাগেরে মানুষটাকে। যতি ফিরে আসে দেখে সাঙা করেছি তোকে, খুনিয়া বসায় দেবে মানুষটা।

—হঃ। অদ্ভুত একটা শব্দ করে মদনা। মানুষটা নাকি আবার ফিরে আসবে। বলে, ও আর বাঁচে নাই রে, বাঁচে নাই।

ফিরুজারও তাই মনে হয়। সেই যে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে গিয়েছিল লোকটা তারপর তো কতদিন কেটে গেছে, ফিরল কই ফিরুজার স্বামী। ফিরবে না সে ফিরুজাও জানে। হয়তো সমুদ্রেই প্রাণ হারিয়েছে, হয়তো মানুষখেকো মাছে টেনে নিয়ে গেছে। তবু ভয় যায় না। যদি কোনোদিন ফিরে আসে, যদি দেখে ফিরুজা তার নতুন করে সাঙা করেছে তাহলে......

নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে উঠল ফিরুজা। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে তীরের ওপর। ক্রমে ক্রমে আকাশের আলো নিভে যাচ্ছে—অন্ধকার নেমে আসছে। আর চাঁদনী রাতের জ্যোৎস্না। ঢেউয়ের গায়ে ঢেউ ফেটে পড়ছে চড়্‌চড়্‌চড়্ শব্দ করে। ঠিক যেন দু-হাতে কাপড়ের জোড়া ছিঁড়ছে কেউ। সঙ্গে সঙ্গে শাদা শাদা ফেনার ফুল উথলে উঠছে ঢেউয়ের মাথায়।

এদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে ফিরুজার। রোজ ভোরবেলায় তাই ছুটে আসে সে, একা একা দাঁড়িয়ে দেখে, অসীম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এক একসময় মনে হয় তার সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষটা এত বড়ো সমুদ্রের কোলে কোথাও বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে।

সে-কথা মনে হলেই শিউরে ওঠে ফিরুজা। মনে মনে ভাবে, সে যেন না আসে, সে যেন না আসে।

আবার কখনো কখনো দু-চোখে জল ভরে আসে হারিয়ে যাওয়া স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে। বুকের ভেতর অসহ্য এক ব্যথা অনুভব করে। অকারণেই মনে মনে বলে, সে যেন ফিরে আসে, সে যেন ফিরে আসে।

হয়তো তার ফিরে আসার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যেই প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে ছুটে আসে ফিরুজা। হয়তো উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, দূরে কোথাও একটা ডিঙিকে ঢেউয়েব পিঠে মাতালের মতো টলতে দেখবে এই আশায়।

সেদিনও এমনি নেশার ডাকেই এসে দাঁড়াল ফিরুজা। ঢেউ যেখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই নীলের সমতলের দিকে তাকিয়ে।

তারপর হঠাৎ চমকে উঠল সে।

দূরে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। ডিঙি নয়, পালের নৌকোও নয়।

হ্যাঁ, ধোঁয়া উড়ছে যেন। আনন্দে চিৎকার করে ঘরের দিকে ছুটে গেল ফিরুজা। স্টীমার। গোরা সাহেবের ইস্টিমার আসছে।

ছুটতে ছুটতে পট্টির সকলকে খবর দিয়ে এল ফিরুজা। সবাই

ছুটে এল তার পিছনে পিছনে।

প্রথম দিনের মতোই সারিবন্দী হয়ে সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়াল তারা। আগ্রহের, ঔৎসুক্যের চোখে তাকিয়ে রইল।

তেমনি আগের মতোই স্টীমারের গা থেকে দুটো সাম্পান নামল। বার কয়েক ফেরি দিয়ে স্টীমারের লোকলস্কর মালপত্তর তীরে এনে তোলা হল।

টিয়ারঙের বাসিন্দেদের কাছে দু-চারটে মুখ চেনা চেনা লাগল। সাহেবী পোষাক-পরা চ্যাটার্জি আর অমিয়বাবুকে দেখে চিনতে পারল ফিরুজা। কিন্তু গোরা সাহেব? তন্ন তন্ন করে খুঁজল সকলে, তারপর হতাশ হল গোরা সাহেবকে দেখতে না পেয়ে। না, গোরাটা আসেনি এবার। তার জায়গায় চ্যাটার্জির কাঁধে বন্দুক, চ্যাটার্জিই যেন দলের রাজা।

—গোরাটার কি হল রে বাবু? ফিরুজা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে এগিয়ে গেল চ্যাটার্জির কাছে।

হাসল চ্যাটার্জি। —সাহেবকে খুব মনে ধরেছে বুঝি? চোখ টিপে বললে, ভয় কি, সাহেব আসেনি, কিন্তু আমি তো আছি। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠে অমিয়বাবুকে কি একটা ইঙ্গিত করলে চ্যাটার্জি।

তারপর ওভারসিয়ার পাঠককে ইশারা করলে তাঁবু ফেলবার জন্যে।

ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই বালির ওপর পরপর কয়েকটা তাঁবু টাঙানো হয়ে গেল। নির্জন ধূ ধূ বালির ওপর কলকোলাহলে মুখর হয়ে উঠল ছোট্ট এক টুকরো নতুন জাগা পৃথিবী।

দিনে দিনে তৈরি হল স্টীমারঘাটা। ছোট ছোট কুঠরী তৈরি হল কয়েক সারি, কুলিকামিন, মাল টানার মোটর, যন্ত্রপাতি সব এসে পৌঁছল।

একটা ভালো দোকানও খুলে ফেলল ব্রিজলাল। একদিকে মদের দোকান, অন্য দিকে মনোহারী থেকে তৈজসপত্র সব কিছু।

ডুগডুগি বাজিয়ে টিয়ারঙের বাসিন্দেদেরও জানিয়ে দিল চ্যাটার্জি, যার খুশি এসে কাজ নিতে পারে। নগদ মজুরি পাবে, পাবে কোম্পানির দোকান থেকে চাল ডাল গামছা চুড়ি।

কিন্তু কাজটা কি? কাজ বিশেষ কিছু নয়। টিয়ারঙের জঙ্গল ইজারা নিয়েছে স্টিফেন্স কোম্পানি। সেই কোম্পানির হয়ে চ্যাটার্জি এসেছে বন থেকে বয়স হওয়া শাল আর সেগুনের গুঁড়ি কেটে চালান দেবার জন্যে।

গাছ কাটবার জন্যে, গুঁড়ি বয়ে বয়ে স্টীমারে তুলে দেবার জন্যে কুলি চাই।

একে একে সকলে এসে যোগ দিল কোম্পানির কাজে।

কমবয়সী কয়েকটা মেয়েকে বেছে নিল চ্যাটার্জি রান্না আর ঘরদুয়োরের কাজের জন্যে।

ফিরুজার দিকে একচোখ তাকিয়ে নিয়ে চ্যাটার্জি বললে, রান্না করতে পারিস?

—পারি গো বাবু। হেসে ঢলে পড়ার ভঙ্গিতে ফিরুজা বললে।

চ্যাটার্জি ফিরুজার পিঠে হাতের একটা হাল্কা থাবড়া দিয়ে বললে, ঠিক্ হায়। মুরগী পাওয়া যায় এখানে? মুরগীর আণ্ডা?

ফিরুজা হাসলে।— তুই হুকুম দিলে বাবু বাঘের দুধটাও মিলবে।

—মিলবে ? ফিরুজার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাটার মধ্যে কোনো দ্বিতীয় অর্থ আছে কিনা খোঁজবার চেষ্টা করলে চ্যাটার্জি। তারপর অমিয়বাবুকে সহাস্যে বললে, বলে কি মশাই, বাঘিনীর দুধও মিলবে।

চ্যাটার্জি ও অমিয়বাবু দুজনেই হেসে উঠল হো হো করে।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে মদনা। হাসিটা ভালো লাগল না তার। ভালো লাগল না ফিরুজার এতখানি ঢলাঢলি।

বাসায় ফেরার পথে মদনা সাবধান করে দিল ফিরুজাকে। বললে, বাবুগুলা দুষমন ।র ফিরুজা, মানুষ ভালো লয় তেনরা।

চমকে ফিরে তাকাল ফিরুজা তার মুখের দিকে। তারপর সশব্দে হেসে উঠল।

—মানুষ ভালো লয় ? সপ্রশ্ন চোখজোড়া যেন কৌতুকে ঝলকে উঠল। পরমুহূর্তেই ফিরুজা দেখতে পেল ঝোপের ভেতর থেকে একটা খরগোশ বেরিয়েই ছুটতে শুরু করেছে। হয়তো তাদের পায়ের শব্দে।

চট্ করে খোঁপা থেকে খুনিয়াটা তুলে নিয়েই তাক্ করে সজোরে সেটা ছুঁড়ে দিল ফিরুজা।

টিয়ারঙের মেয়েদের খুনিয়ার লক্ষ্য কি ভুল হয় ? ঠিক খরগোশটার গায়ে বিঁধে গেল খুনিয়াটা। ফিনকি দিয়ে এক ঝলক রক্ত ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত খরগোশটা নেতিয়ে পড়ল।

খলখল করে সশব্দে হেসে উঠল ফিরুজা।

তারপর ছুটতে ছুটতে এসে খরগোশটার ঠ্যাঙ ধরে তুলে বললে, তুই চ ; আমি বাবুকে সেলাম দিয়ে আসছি এখনই।

বলে তরতর করে আবার চ্যাটার্জির ঘরের দিকে চলে গেল ফিরুজা। খরগোশটা তখনো ছটফট করছে তার হাত থেকে ঝুলতে ঝুলতে।

ফিরুজা হেলে দুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু মদ্‌নার পা সরল না। ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল সে।

অপেক্ষা করে করে পা টনটন করে উঠল তার, তবু ফিরুজার পাত্তা নেই। এদিকে অন্ধকার বাড়ছে ক্রমশঃই। রাত বাড়ছে। এতক্ষণ, এত রাত অবধি কি করছে ফিরুজা ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধের কুড়ুলটা তুলে এক ঘা বসিয়ে দিল সে গাছের গুঁড়িটায়। তারপর রাগে দপদপ পা ফেলে বাড়ির পথ ধরল।

তিন

সমুদ্রের পাড় থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে বেশ কিছুটা উঁচু লেভেলের ডাঙা জমি। তার এক ধারে সারি সারি তাঁবু পড়েছিল প্রথম দফায়। এবার তাঁবু উঠে গেল, গড়ে উঠল এক সারি ছোট ছোট বাংলো। বাংলোর সামনে ফুলের বাগান। স্টিফেন্স কোম্পানির নিজস্ব ডাইনামো শব্দ করে জেগে উঠল, আলো জ্বলল বাংলোর ঘরে ঘরে। কুয়োর জল তুলে বাংলোয় পৌঁছে দেবার জন্যে পাম্প বসল। রীতিমত একটা ক্ষুদে শহর গজিয়ে উঠল টিয়ারঙে।

কোম্পানি মহল থেকে স্টীমারঘাটা অবধি একটা চওড়া রাস্তা বাংলোর সারি পার হয়ে কাঠগুদামে পৌঁছেছে। তারপর সেখান থেকে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে বনের ভেতর পর্যন্ত।

একে একে চ্যাটার্জি, অমিয়বাবু, আরো অনেকে স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে এলেন। সুযোগ পেলে কোনো একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন এই আশায় অমিয়বাবু নিয়ে এলেন তাঁর মেজো শ্যালক সৌমেনকে। চ্যাটার্জির স্ত্রীর এই বনবাসে সাহচর্য দেবার জন্যে এল মিসেস চ্যাটার্জির ছোট বোন তামসী।

তামসীর নামটা তার চেহারার সঙ্গে যে মানানসই তা নয়। অতিশয়োক্তিই বলা চলে। কারণ তার গায়ের রঙ যদিও একটু চাপা তবু সব মিলে কেমন একটা আকর্ষণ আছে তার চেহারায়। দোহারা স্বাস্থ্যে ভরা শরীর। যৌবনের মসৃণ আভায় সর্বাঙ্গ ঝলমল করে ওঠে যে বয়সে, তামসীর ঠিক সেই বয়েস। ভরাট মুখে চমৎকার একটা হাসি যেন সর্বক্ষণ লেগে আছে। চোখ দুটো চটুল। তার চেয়েও চঞ্চল তামসীর শরীর। দৌড় ঝাঁপ, ছুটোছুটি, হাসি চিৎকার। যেন একটা

ফুর্তির প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়ায়। মনে হয় এবার বুঝি এ ফুলে বসবে, নয়তো ও ফুলে। কিন্তু না, কেবল উড়ে উড়েই বেড়ায়। বসতে চায় না সে সুস্থির হয়ে।

পাশের বাংলোর সৌমেন কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ। চুপচাপ একা একা থাকে। মাথা নীচু করে পথ হাঁটে। মেয়েমানুষ দূরের কথা, শাড়ি দেখলেই শামুকের মতো খোলসের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে নেয়। নিজেকে নিয়েই যেন সম্পূর্ণ, নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট।

তার হাবভাব দেখে তামসীর বড়ো মজা লাগে। প্রথম প্রথম আড়চোখে তাকাত ও, মুচকি হেসে চোখ ঘুরিয়ে নিত অন্যদিকে। কিন্তু এই টিয়ারঙ দ্বীপে, এই সভ্যতার স্পর্শচ্যুত আদিম অবণ্যবাতাসে সব লজ্জার আবরণ বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যায়। ক্রমশঃ তাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠল তামসী, সপ্রতিভ।

পাশাপাশি বাংলো। কারণে অকারণে এ ওর বাড়িতে ছুটে যায়। দুদণ্ড কথা বলে গল্প করে যেন সময়-হারানো দ্বীপের দুঃসহ সময়টুকু কাটাতে চায়।

প্রথম প্রথম তামসী একটু সংযত ছিল। একটু অস্বস্তির গতিভঙ্গি ছিল তার চলায় বলায়।

অমিয়বাবুর স্ত্রী হয়তো আচারের শিশি খুলে রোদে দিচ্ছে, এক টুকরো আচার তুলে নিয়ে খিলখিল করে হেসে সেটা জিভে ঠেকাতে ঠেকাতে তামসী বলত, টিয়ারঙ আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে, রাণুদি।

—ভালো লাগছে? আমি তো এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলুম। রাণুদি উত্তর দিত।

ক্রমশঃ রাণুদিও বুঝল, কেন এত ভালো লাগে তামসীর। তার আড়চোখে সৌমেনের ঘরের দিকে ঘনঘন তাকানো দেখে হাসত মুখ টিপে টিপে।

মজা দেখবার জন্যেই যেন ইচ্ছে করে সৌমেনকে ডাক দিত।

—ছোটদা শুনে যা একবারটি।

কেমন জড়োসড়ো হয়ে এসে হাজির হত সৌমেন।

রাণুদির চেয়ে বছর দুইয়ের বড়ো সৌমেন, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন কত ছোট। এত ছোট এত ভালমানুষ যে সৌমেনকে সে তুই বলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সৌমেনের ভাবগতিক দেখে মনে মনে হেসে লুটোপুটি খেত তামসী। ও মা এত লাজুক। এ যে মেয়েমানুষেরও অধম।

কিন্তু লজ্জা তো মনের ঘরের চাবি নয়। তাই হাঁটতে গিয়ে যখন সৌমেনের পায়ে পা জড়িয়ে যেত তখনো মন কিন্তু তার ছুটত পাগলা ঝড়ের মতো। গোপন মনে একান্ত নির্জনে বসে বসে তামসীর কথাই ভাবত সৌমেন।

—বেশ ছিমছাম মেয়েটি, না রে রাণু? তামসী কাছেপিঠে না থাকলে মুখ ফুটত সৌমেনের।

ফিক ফিক করে হাসত রাণু। তামসীকে ঠাট্টা করে বলত, কি মন্ত্র যে পড়েছ ভাই, ছোটদা আমার দিনরাত তোমার কথাই ভাবে।

লজ্জায় কান লাল করে তামসী নাকী সুরে বলত, চটাবেন না বলছি।

—বাঃ রে যা সত্যি তাও বলতে দোষ!

ঠোঁট ফোলাত তামসী।— সত্যি, না ছাই।

রাণু হেসে বলত, সত্যি বলছি, আজ ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখি কি, টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া একরাশ কাগজ।

প্রেমপত্র মনে করে আঁতকে ওঠে তামসী। বলে, কক্ষনো না, মিছে কথা। অত লাজুক যে, সে কখনো চিঠি লিখতে পারে না।

রাণু হেসে ফেলে।— না গো মেয়ে না, চিঠি নয়। চিঠির জন্যে মন ছটফট করছে বুঝি ?

লজ্জা পায় তামসী।— চিঠি নয় ? তবে ?

রাণু বলে, প্রথমটা আমিও তাই ভেবেছিলাম। টুকরোগুলো জুড়ে জুড়ে দেখি কি, সারা কাগজটায় অষ্টোত্তরী শতনাম।

—মানে ? তামসী বুঝতে পারে না যেন।

রাণু হেসে বলে, সারা কাগজটার ওপর থেকে নীচে অবধি শুধু একটি নাম লক্ষ বার লিখেছে ছোটদা।

—কি নাম ?

—তামসী।

তামসীও ফিক্ করে হেসে ফেলে।— বোধহয় কলমের নিব ঠিক আছে কিনা দেখেছেন।

—হুঁ, আমারও তাই মনে হয়। নিবটা ঠিক হলে বাকীটুকু লেখা হত।

তামসী রাগ দেখিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু ছুটে পালিয়ে কি রেহাই আছে। মনের মধ্যে গুনগুন করে কি যেন।

গানের সুরের গুনগুনুনি শুনেই দিন কাটে তামসীর। নিজের গানেই নিজে মুগ্ধ হয়। স্বপ্ন বোনে মনে মনে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় টিয়ারঙের আদিম অধিবাসীদের মতোই

উদ্দাম হয়ে উঠতে। এত লজ্জা, এত বাধা নিষেধ, শহুরে মনের শান্ত নম্র ভাবটুকু ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে প্রাণের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় কখনো কখনো।

ফিরুজাকেও তাই বোধ হয় ঈর্ষা করে তামসী।

তার স্বাস্থ্য শ্রী, তার প্রাণখোলা খিলখিল হাসি, তার স্বতঃস্ফূর্ত অলজ্জ স্পষ্টতা।

হঠাৎ যেদিন তামসীর দিদির কাছে হেলেদুলে শরীরের ছন্দ নাচিয়ে হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল ফিরুজা, সেদিনটার কথা মনে আছে তামসীর।

সমুদ্রের নোনা জলে স্নান করে উঠে এসেছিল ফিরুজা। টকটকে লাল রঙের ঘাগরা, বুকে এক ফালি হলদে আঙিয়া, তার ওপর ফিকে নীল রঙের জালি ওড়না। ভিজে শরীরের জল লেগেছে ঘাগরার এখানে ওখানে, জালি ওড়নায়। স্বাস্থ্যে ভরা মুখখানা বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছিল ফিরুজার। ফরসা রঙের ওপর একটা নোনা হাওয়ার কালচে ভাব। বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছিল ফিরুজাকে। পিঠের ওপর এলিয়ে পড়া একরাশ চুল যেন সারা পিঠ ঢেকে লুটিয়ে পড়েছে কোমরের নীচে অবধি। একটা কাঠের কাঁকুই দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তামসীদের বাসার সামনের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল ফিরুজা।

—ও তাপুদিদি, বড়্দিদিগো। শোনেন না একবারটি।

তামসীর দিদি তাপসী ডাক শুনে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর ফিরুজার সাজপোষাক দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল।

—কি ব্যাপার রে ফিরুজা? বিয়েসাদী করতে যাচ্ছিস নাকি? হেসে জিগ্যেস করেছিল তাপসী।

ফিরুজাও কলকলিয়ে হেসে ওঠে।— সাদী তো একবার হয়েছিল গো ঠাকরুন। তা মানুষটা সাম্পান নিয়া গেল মাছ ধরতে তো ফিরল না আর।

তামসী হেসে ওঠে কথা শুনে। বলে খোঁজ করলি না কোথায় গেল?

ফিরুজা হেলে দুলে এগিয়ে আসে। বলে, তার কথা চিন্তা করেই তো আধেক যৈবন কেটে গেল ছুটদিদি। তাই ভাবলাম, মানুষটা গেছে যাক্, যৈবন গেলে তো আর ফিরবে নাই।

কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে তামসী আর তাপসী।

স্পষ্ট কথা। মানুষটা গেছে বলে যৌবন তো আর অপেক্ষা করে থাকবে না। সত্যি কথাই তো।

—তা কি আবার একটা মানুষ যোগাড় করবি নাকি? হাসির দমক চাপতে চাপতে তামসী জিগ্যেস করে।

ফিরুজা হাসির অর্থটুকু যেন ভালো করে বুঝতে পারে না।

বলে, মাদোনটাকে তো দেখেছিস ঠাকরুন, তো মানুষটা ভালোই। ভাবলাম, একটা মানুষ ঘর ছেড়ে বিবাগী হল তো মাদোনটাকেই বান্ধে আনি।

তাপসী হাসল। —তা আনলি না কেন?

ফিরুজার মুখের হাসিটা যেন দপ্ করে নিভে গেল।

বললে, ভয় লাগে দিদি। মানুষটা অটাং ফিরে আসে তো প্রাণ জখম করবে খুনিয়া দিয়ে।

—হুঁ। সমস্যাটা যেন তাপসীও বুঝতে পারে।

তামসী তখনো ফিকফিক করে হাসছে।

ফিরুজা তা দেখে বলে, হাসিস কেন গো দিদি। পরক্ষণেই ভিক্ষের ভঙ্গীতে বলে, তোর আরসিটা দেন না গো একটিবার।

তামসী আর তাপসী মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে।

—আরসি? কেন আয়না নিয়ে কি করবি?

ফিরুজা লজ্জার হাসি হাসলে পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে।—বেশভূষাটা দেখব, চুল বাঁধব গো দিদি।

—কেন রে, এত সাজপোষাক করার দরকার হল কেন? তামসী প্রশ্ন করলে।

ফিরুজা হাসল, উত্তর দিলে না প্রথমটা। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মাদোনটার সাথে আজ ডিঙিতে করে যাব সমুদ্দুরে মাছ ধরবার তরে।

উত্তর শুনে দু-বোনই সশব্দে ফেটে পড়ল উদ্দাম হাসিতে।

তামসী হেসে বললে, আমাকে নিয়ে যাবি?

—না গো দিদি, তুমরা টাল রাখতে পারবে নাই। জলের মানুষ আমরা, জল আমাদের চিনে।

তাপসী বললে, আয়নাটা এনে দে তামু। তারপর কানে কানে বললে, সেন্টের শিশিটাও।

তামসী আয়নাটা এনে দিল, আর তাপসী সেন্টের শিশি থেকে খানিকটা ছিটিয়ে দিল ফিরুজার পোষাকে।

যেখানটায় সুগন্ধির ছিটে পড়ল ওড়নার সেইখানটা নাকের কাছে ধরে জোরে নিঃশ্বাস টানল ফিরুজা। খুশিতে ভরে উঠল ওর মন।

বললে, বড়ো দামী খুশবাই, না রে দিদি? মনটা উদভ্রান্ত লাগে।

বলে নিজের মনেই হেসে উঠল ফিরুজা। তারপর আয়নাটা সামনে নিয়ে কাঠের কাঁকুই দিয়ে সযত্নে চুল আঁচড়াতে, বিনুনি বাঁধতে শুরু করলে।

চুল বেঁধে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখটা আয়নায় দেখে ফিক্ করে হেসেই দ্রুত পায়ে পালিয়ে গিয়েছিল ফিরুজা, সমুদ্রের পাড়ের দিকে, সমুদ্রের দিকে।

এমনি সমুদ্রের দিকে, সমুদ্রের তীরে ছুটে আসতে ইচ্ছে হয় তামসীরও। এত লোকের মাঝেও দ্বীপটা যেন বড়ো নির্জন মনে হয় তার। বড়ো বেশি নিঃশব্দ।

শুধু অবিরাম ছন্দে বেজে চলেছে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। ব্রেকারের একঘেয়ে ছন্দ, একটানা শব্দ। রাত্রির নিঃশব্দতায় সে-শব্দ যেন আরো বেশি কানে বাজে।

প্রথম প্রথম এই আওয়াজে ঘুম আসত না তামসীর। দিনের চেয়েও রাতটা ছিল আরো বেশি ভয়াবহ। আরো বেশি দুঃসহ।

টিয়ারঙ ছেড়ে পালাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠত।

কিন্তু কয়েকটা মাস যেতে না যেতে মন বসে গেল তামসীর। কেন, কেমন করে সে নিজেই যেন বুঝতে পারে না।

কিসের নেশায় ? সৌমেন ?

মাসে একবার মাত্র চঞ্চল হয়ে উঠত টিয়ারঙের জীবন। শুধু একবার।

ক্রমে ক্রমে টিয়ারঙের স্টীমারঘাটার বনিয়াদ পাকা হল। স্টীমার-ঘাটা রূপান্তরিত হল জাহাজঘাটায়।

চার

আল্ভার হাতের তিনতারার সুর শুনেই বেরিয়ে এসেছিল সৌমেন।

বাউলের হাতের একতারার মতো আল্ভাকে চেনা যেত তার তিন তারের 'রাবা' দেখে। রাবার সুর শুনে দূর থেকেও লোকে বুঝতে পারত আল্ভা বুনো বাতাসের গায়ে তার গানের মূর্ছনা ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে।

বড়ো মিঠে সুর এই রাবার। তিনটি তারে টুং টাং ধ্বনির লুটোপুটি যেন ঢেউয়ের মতো ভেঙে ভেঙে পড়ে সমুদ্রের গায়ে। তার চেয়েও মধুর আল্ভার পরিপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠের গান।

আত্মভোলা এই লোকটি যেন টিয়ারঙের সবচেয়ে বড়ো রহস্য। দস্যুর মতো বিরাট চেহারা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল, গলায় একটা প্রবালের মালা। প্রবাল নয়, প্রবালের মতোই দেখায়। সমুদ্রের পাড়ে বালির গায়ে গায়ে জমে থাকে কি এক ধরনের ছোট ছোট শামুক। রঙটা লাল আর হলুদের মাঝামাঝি। মেয়েরা তার মালা গেঁথে গলায় পরে, খোঁপায় জড়ায়। পেশীবহুল স্বাস্থ্যবান জোয়ান চেহারা আল্ভার, তার গলায় তাই এই লাল রঙের মালাটা বড়ো অদ্ভুত দেখায়। অদ্ভুত কিন্তু সুন্দর।

হাতে থাকে রাবা। টিয়ারঙের বাসিন্দেরা বাঁশির চেয়ে এই তিন-তারার ভক্ত, তাদের ভাষায় যার নাম দিয়েছে তারা 'রাবা'। ঢোলক বাজিয়ে আগুনিয়া পরবের নাচ নাচে মেয়েপুরুষ সবাই, আর একদল এই রাবা বাজিয়ে গান গায়। টিয়ারঙে যেমন তাঁত বুনতে জানে না এমন মেয়ে নেই—তেমনি পুরুষ নেই যে কিনা রাবা বাজায় না। কিন্তু আল্ভার হাতে তা যেন আরো মিষ্টি হয়ে বেজে ওঠে।

প্রথম দিন সৌমেন এই আল্‌ভার গান শুনেই মুগ্ধ হয়েছিল, তারপর তার বিশাল চেহারা দেখে। তারের ওপর আঙুলের খেলার সঙ্গে সঙ্গে আল্‌ভার কাঁধের পেশীও যেন নেচে নেচে ওঠে।

ওভারসিয়ার পাঠকের বাংলোর সামনে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে গান গাইছিল আল্‌ভা। উচ্চগ্রামে বাঁধা তার কণ্ঠের সুর যেন কাঁপিয়ে তুলছিল সারা আকাশ-বাতাস। দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল সৌমেন। তারপর কখন যেন তন্ময় হয়ে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসেছিল।

গান শেষ করে আল্‌ভা তাকাল সৌমেনের দিকে। একমুখ হেসে সেলাম করলে।

তারপর প্রশ্ন করলে, আর গান শুনবেন হুজুর ?

সৌমেন হেসে বললে, বড়ো মনমাতানো গান তোমার আল্‌ভা। গাও আরেকটা···

আল্‌ভা হেসে তার বাবরি চুল ঠিক করে নিয়ে গান ধরল :

ফির্‌্যা তাকাও মনমাতালি
শোনাও তোমার গান,
তোমার তরে আনলাম আমি
সোনায় মোড়া সাম্পান।

গান শেষ হতে সৌমেন পয়সা দিতে গিয়েছিল তাকে। হেসে পয়সা ফেরত দিলে আল্‌ভা।

—পয়সা দিবেন না হুজুর। আল্‌ভা গরিব নয়।

না, আল্‌ভার ধারণা তার চেয়ে ধনী নেই কেউ।

ফিরুজাকে জিগ্যেস করেছিল সৌমেন।

ফিরুজা উত্তর দিয়েছিল, ও একটা পাগল বাবু।

পাগলই হয়তো। বউ ছেলে নেই, সঙ্গীসাথী নেই, আপন মনে শুধু গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায়। দ্বীপের বাসিন্দেদের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ায়—আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি। টিয়ারঙের অধিবাসীও নয় আল্‌ভা। হঠাৎ একদিন ডিঙি নিয়ে এসেছিল কোত্থেকে। তারপর রয়ে গেল এখানেই। কাজকর্ম নেই, শুধু গান গায়।

আর মাঝে মাঝে পাগলের মতো চোখে তাকিয়ে বলে, মোহরগুলান স-ব চুরি হয়ে গেল, স-ব চুরি হয়ে গেল।

কিসের মোহর, কে চুরি করল সেকথা জিগ্যেস করলেও বলে না।

শুনে সৌমেনের কেমন রহস্য রহস্য মনে হয়। ইচ্ছে হয় একদিন নিজেই সে জিগ্যেস করবে। কিন্তু সাহস পায় না।

ফিরুজা সাবধান করে দিয়েছিল, মোহরের কথা কইলে মানুষটা পাগল হয়ে যায় বাবু। খুন চেপে যায় ওর।

সে-কথা শুনেই একটু দূরে দূরে থাক্‌ত সৌমেন। কাছে যাবার সাহস হত না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় আল্‌ভার রাবা বেজে উঠতেই আবার কেমন এক আকর্ষণ বোধ করলে সৌমেন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে রাবার সুমধুর ধ্বনি লক্ষ্য করে।

দেখলে, একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একমনে গান গাইছে আল্‌ভা।

এ এক অবোধ্য আকর্ষণ। সব সাবধানী উপেক্ষা করে কাছে এগিয়ে গেল সৌমেন। আল্‌ভার কাছে বসে পড়ল।

কিন্তু তাকে যেন লক্ষ্যও করেনি আল্‌ভা। তেমনি গলা ছেড়ে গান গেয়ে চলে সে। থামতে চায় না।

অনেকক্ষণ পরে গান থামাল সে।

তারপর সৌমেনকে দেখে যেন বিস্মিত হল। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখে দেখল সে সৌমেনকে।

চিনতে পেরে বললে, সেলাম হুজুর।

—সেলাম আল্‌ভা।

বাবুপাড়ার একটা লোক কিনা তাকে সেলাম করছে! হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল আল্‌ভা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল পরমুহূর্তেই। ফিসফিস করে বললে, একটা আরজি ছিল হুজুর।

—কি আরজি আল্‌ভা?

—আমারে একবার মাটিতে নিয়া চলেন হুজুর।

মাটিতে। দ্বীপের মানুষদের কাছে টিয়ারও হল 'জল', সমুদ্রের ওপারে সুন্দরবন, কিংবা গঞ্জের দিকটা, অর্থাৎ চট্টগ্রামের উত্তর দিকটাকে তারা বলে 'মাটি'। সেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে গেলেও নাকি মাটি ফুরোয় না, তাই।

সৌমেন বিস্মিত হয়ে বললে, কেন আল্‌ভা?

আল্‌ভা চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে বললে, আপনারেই বল্‌ছি হুজুর। গোপন রাখবেন কথাটা।

তারপর ধীরে ধীরে বললে আল্‌ভা, তার গোপন কথা। আল্‌ভার কাছে নাকি একটা নকশা আছে। তার বাপ মরবার সময় দিয়ে গেছে। বাপকে দিয়ে গিয়েছিল তার বাপ। আর সেই নকশাতে লেখা আছে 'মাটি'তে কোথায় ঘড়া ঘড়া মোহর পুঁতে রেখে গেছে তাদের কোন এক পূর্বপুরুষ।

ফিরুজার সাবধানবাণী মনে পা :তেই কোনোরকমে বিদায় জানিয়ে সরে এল সৌমেন।

লোকটা তাহলে সত্যিই পাগল।

একা একা সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে আল্‌ভার কথাটাই ভাবতে শুরু করলে সৌমেন।

হঠাৎ একসময় মনে হল, আল্‌ভার কথাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। পাগল নয় হয়তো সে। মগধাওনির ইতিহাস মনে পড়ে গেল সৌমেনের।

মগ আর পর্তুগীজ দস্যুরা শায়েস্তা খাঁর আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে আসার সময় ঘড়া ঘড়া মোহর, হীরে-জহরত, তাদের লুঠের সম্পদ নাকি মাটিতে পুঁতে রেখে পালিয়ে এসেছিল, আশ্রয় নিয়েছিল এই সব ছোট ছোট অজ্ঞাত দ্বীপে।

সৌমেনের মনে হল, তেমনই কোনো দস্যুর বংশধর হয়তো আল্‌ভা। আল্‌ভার নামটা কেমন যেন বিদেশী বিদেশী, হঠাৎ আবিষ্কার করলে সে।

ইচ্ছে হল আবার ফিরে যেতে। ফিরে দাঁড়িয়েই কিন্তু চমকে উঠল সৌমেন। দেখলে, দূরে জোৎস্না-ভেজা অন্ধকারে একটি নারীর ছায়াশরীর একা একা এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সৌমেন।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল আবছায়ার নারীদেহ। স্পষ্ট চিনতে পারল সৌমেন। সমস্ত শরীরে তার রোমাঞ্চের শিহরন খেলে গেল।

তামসী!

কিন্তু একা এই অন্ধকারে কোথায় চলেছে তামসী?

বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচলিত হয়ে উঠল সৌমেন। দেখলে, ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তামসী। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন এক অশরীরীর আকর্ষণে যেন এগিয়ে চলেছে।

ঝড় উঠল এদিকে। কালো মেঘের পাগলা ঝড় সোঁ সোঁ করে ছুটে এল। ঢেউয়ের দাপাদাপি ফুলে ফুঁসে উঠল সমুদ্রের বুকে।

তখনো ঝড়ো বাতাসে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে তামসী। ছায়াশরীরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল গ্যাংওয়ের ওপর। পাগল হয়ে গেছে নাকি? ঝড়ে উড়ে পড়ছে তামসীর শাড়ির আঁচল, চুল উড়ছে। তবু গ্যাংওয়ের রেলিং ধরে ধরে এগিয়ে চলে তামসী। একেবারে সমুদ্রের বুকের মধ্যে।

একটু আগেই ঝড়ের সম্ভাবনা জানিয়ে ঘণ্টা বেজে উঠেছিল, আবার ঘণ্টা বেজে উঠল জোয়ারের আশঙ্কা জানিয়ে।

হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেল সৌমেন। আতঙ্কে শিউরে উঠল।

সৌমেনের হঠাৎ সন্দেহ হল, তামসী বোধ হয় আত্মহত্যা করতে চলেছে।

মুহূর্তমাত্র। মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নিল সৌমেন।

তারপর চিৎকার করে ডাকলে, তামসী! তামসী!

বাতাসের গায়ে অদ্ভুত শোনাল তার আতঙ্কের চিৎকার। কিন্তু তামসীর কানে গিয়ে পৌঁছল না সে-ডাক। সমুদ্রের গর্জন আর ঝড়ো বাতাসের সনসনানির মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

পরক্ষণেই চিৎকার করতে করতে ছুটতে শুরু করল সৌমেন।

—তামসী! তামসী!

শঙ্কিত কণ্ঠের চিৎকার ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। শুনতে পেল তামসী।

শুধু বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল সে। ফিরে দাঁড়াল। দেখলে, সৌমেন ছুটে আসছে তার দিকে।

কিন্তু কেন? যার ডাক শোনবার জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে, যার কাছ থেকে এতটুকু ইশারার হাতছানি পেলেই ছুটে যেত, সে নিজেই ছুটে আসছে তামসীর কাছে।

বড়ো দুর্বোধ্য ঠেকল তামসীর। তবু অকারণেই সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চের শিহরন খেলে গেল তার।

ফিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল সে।

কাছে এসে পৌঁছল সৌমেন। তামসীর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, না না তামসী, এ কি করতে চলেছ তুমি, এ হতে পারে না, এমন ভাবে নিজেকে নষ্ট করতে পাবে না তুমি।

প্রথমটা বিস্মিত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল তামসী। পরক্ষণেই খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠল সে।

ধীরে ধীরে কপট গাম্ভীর্যে বললে, আমার জীবনের কিই বা মূল্য। এমন একটা জীবন নষ্ট হলেই বা ক্ষতি কি তোমার?

সৌমেন তখনো নিজের ভুল বুঝতে পারেনি।

সে বললে, না না তামসী, তা হতে পারে না।

ফিক্ করে হেসে ফেলল তামসী। বললে, এখান থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখতে চাই সেখানে কত শান্তি।

সৌমেন বললে, না তামসী, তা হয় না।

—কেন?

তামসীর অপাঙ্গে কৌতুকের হাসিটা দেখতে পেল না সৌমেন উচ্ছ্বাসের কণ্ঠে বললে, তোমাকে হারিয়ে যে এক মুহূর্তও আমি থাকতে পারব না তামসী। আমি···আমি···

সব কৌতুক হাসি মিলিয়ে গেল তামসীর মুখ থেকে। বিস্ফারিত দুটি অনিমেষ চোখে সৌমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, চল, ফিরে যাই।

—চল।

দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ ফিরে চলল গ্যাংওয়ের পথ ধরে, বালি মাড়িয়ে, লতাঝোপের পাশ দিয়ে, বাবুপাড়ার পথ ধরে।

যেতে যেতে হঠাৎ একসময় তামসী প্রশ্ন করলে, খুশি হয়েছ তুমি?

—হ্যাঁ। তুমি?

লজ্জায় মাথা নীচু করলে তামসী। এতক্ষণ যেন চেতনা হারিয়ে গিয়েছিল তার। হঠাৎ একরাশ লজ্জা এসে সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল।

বাংলোর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল তামসী। চোখ তুলে তাকাল সৌমেনের দিকে।

তামসীর হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে ঈষৎ চাপ দিয়ে হাত ছেড়ে দিল সৌমেন, দ্রুতপায়ে চলে গেল সেখান থেকে।

একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল তামসী। মনের কোণে মৃদু মধুর গুঞ্জরনের মুগ্ধতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে।

মনে মনে বললে, ভুল বুঝে ভুলের বোঝা বাড়িয়ে দিলে সৌমেনদা।

তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই চমকে উঠল তামসী। কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে আসছে।

থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে সে। হ্যাঁ, একটি নারীর ছায়াশরীর

[illegible]য়ে ছুটে পালাল অন্ধকারের দিকে। ফিরুজা? ফিরুজা বলেই মনে হল যেন।

কিন্তু কি করছিল ও এই অন্ধকার ঘরে? কেনই বা ছুটে পালাল।

ঘরে ঢুকেই তামসী প্রশ্ন করলে, দিদি, ফিরুজা এসেছিল?

—ফিরুজা? তাপসী বিস্মিত হল। বললে, কই না তো।

পাঁচ

লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরে এল ফিরুজা। বাবুবাংলো থেকে গাঁওপাড়ায় ফিরে এসে দেখলে, কাঠপাতা জ্বালিয়ে আগুনের কুণ্ডলীকে ঘিরে বসেছে গাঁয়ের সকলে।

জনকয়েক ছোক্‌রা বসে জুয়া খেলছে এক পাশে, হাতের কাছে চোলাই করা দিশী মদের ভাঁড়। একবার করে ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে তারা কড়ি চালছে একমনে। আরেক পাশে বুড়ো সর্দার মাধোকে ঘিরে কি যেন সলাপরামর্শ চলছে।

মেয়েগুলো নেচে নেচে ঘুরছে, পাক দিচ্ছে আগুনের কুণ্ডলীকে। আর আল্‌ভা রাবার তারে তালে তালে টুংটাং বাজিয়ে গান গাইছে গলা ছেড়ে।—সই, সাধেবাদে আগুন জ্বেলেছি .....

সুরে সুর মিলিয়ে ফিরুজাও গেয়ে উঠল।

হঠাৎ ফিরুজার গলা শুনতে পেয়েই চমকে ফিবে তাকাল সকলে, তারপর জোয়ান ছোকরাগুলো হেসে উঠল হো হো করে।

ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না ফিরুজা। গিয়ে বসল মাধো সর্দারের পাশে।

মাধো সর্দার তখন আগুনিয়া উৎসবের বিধান দিচ্ছে সকলকে।

আগুনিয়া টিয়ারঙ অধিবাসীদের বহুদিনের পরব, টিয়ারঙের ধর্ম। এ সময়টায় বনের একটা অংশ বেছে নিয়ে খরগোশ বলি দিয়ে পুজো হয় প্রতি বছর। নির্দিষ্ট এলাকার চারপাশে খুঁটি গেড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় গাছে গাছে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন, লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

প্রতি বছরেই এ উৎসব হয়ে আসছে। টিয়ারঙের লোকদের হাতে

[illegible] পয়সা ছিল না। ছিল শুঁটকি মাছ আর ধান। এখন কোম্পানির কাজ করে হাতে পয়সা এসেছে তাদের। তাই অন্যবারের চেয়ে আরো ভালো ভাবে পরব করতে হবে। হাঁড়িয়া আর খাটাস-খরগোশের মাংস চলবে সারারাত। নাচ আর গান থামতে পাবে না এক মুহূর্ত।

সীমানা ঠিক করে দিল মাধো।

মাধোর মেয়ে আকাশী বললে, আগুনিয়া হবে, বাবুদের ডাকবি না তোরা?

মাধো হাসল। বললে, ডাকব, উদের সক্কলরে ডাকব।

শুধু ফিরুজা বললে, বাবুরা পরবে আসবেনি রে আসবেনি।

মাধো সান্ত্বনা দিলে, আমি আনব উদের, আমি ডাকে আনব।

কেউ আর প্রতিবাদ করল না। ডেকে আনতে পারে সে-তো ভালোই।

আগুনিয়া পরবের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এল মাধো। চ্যাটার্জি, অমিয়-বাবু, পাঠককে। সরল বিশ্বাসে নিজেদের আনন্দের ভাগ দিতে চাইল টিয়াবঙাঁরা। কেউ কল্পনাও করল না, এই সরল আমন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত এমন একটা দুর্ঘটনার কারণ করবে।

বাবুপাড়ার সবাই রাজী হল আসতে। কিন্তু কেউই প্রশ্ন করল না আগুনিয়া পরবটা কি।

জিগ্যেস করলে হয়তো এমন একটা অঘটন ঘটত না।

পরবের দিনে বাবুবাংলোর সকলেই এল। চ্যাটার্জি কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে, অমিয়বাবু, পাঠক, সৌমেন আর তামসী।

অদ্ভুত এই টিয়ারঙের মানুষগুলো। চালে চলনে কথাবার্তায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও কোথায় যেন একটা আদিম বন্যতা লুকিয়ে আছে তাদের শরীরে। সকলে ভাবলে, পরবটাও হয়তো তেমনি অদ্ভুত কিছু। বিচিত্র আচার আচরণ কিছু দেখতে পাবে এই লোভেই এসে দাঁড়াল তারা।

দেখলে, বনের একপাশে জড়ো হয়ে একটা আগুনের কুণ্ডলীকে ঘিরে নেচে চলেছে মেয়েপুরুষ সবাই। পুরুষগুলোর হাতে জ্বলন্ত মশাল।

নাচ আর গানের হল্লা চলল বহুক্ষণ ধরে। মাঝে মাঝে মদের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে নেয় মেয়েগুলোও। নাচ তো নয়, যেন মদের নেশায় টলছে সকলে। মেয়েগুলোর শরীর থেকে কাপড় খসে পড়েছে, ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে।

শুধু মাধো সর্দার বসে বসে মন্ত্র পড়ছে বিড়বিড় করে, আর রাবা বাজাচ্ছে আল্‌ভা।

গলা ছেড়ে গাইছে আল্‌ভা :

> আন্ধাইরা নিঝুম রাতি
> আস্‌মানে জ্বলে তারা
> মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া ॥

সমস্বরে ধুয়া ধরে মেয়েরা :

> আস্‌মানে জ্বলে তারা
> মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া

আলভার পূর্ণকণ্ঠের গান ভেসে আসে আবার :

লাজেতে গইলা পড়ে
কন্যার মাথার কেশ
আস্তে ব্যস্তে টানিযা কন্যা
পরে নিজ বেশ ॥

সমস্বরে ধুয়া ধরে মেয়েরা :

আস্তে ব্যস্তে টানিয়া কন্যা
পরে নিজ বেশ।

ক্রমে ক্রমে উদ্দাম হয়ে ওঠে ঢোলকের আওয়াজ।

তারপর একসময় হুকুম দেয় মাধো।

চিৎকার করে বলে, আগুন লাগায় দে। লাগায় দে আগুন।

হৈ হৈ করে চিৎকার করে ওঠে সকলে। পুরুষগুলো হাতের জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ছুটে যায়, গাছে গাছে শুকনো ডালে আগুন লাগাবার জন্যে।

চ্যাটার্জি, অমিয়বাবু, পাঠক সকলেই বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এ কি করতে চলেছে এরা ?

দামী দামী সেগুন গাছে এইভাবে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করতে চায় তারা ? সমস্ত বন যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফার স্বপ্ন দেখে কোম্পানি-মহলের পত্তন করেছে স্টিফেন্স সাহেব, গ্যাংওয়ে বানিয়েছে, বাংলো গড়েছে। যার লোভে ছুটে এসেছে তারা, সেই সেগুন গাছের বন পুড়িয়ে নষ্ট করতে চায় টিয়ারঙের অধিবাসীরা ?

চ্যাটার্জি হঠাৎ গর্জন করে উঠল।—এই !

চমকে ফিরে তাকাল সকলে।

চ্যাটার্জি চিৎকার করে ধমক দিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল তাদের দিকে। বললে, একটা গাছেও যদি আগুন লাগে, বন্দুকের গুলিতে···

মাধো সর্দার ছুটে এল।—এটা পরব হুজুর! আগুনিয়া পরব। এটা ধরম আমাদের।

চ্যাটার্জি বললে, না। বনে আগুন লাগানো চলবে না।

কাকুতি মিনতি করলে মাধো। ধর্মের আচার না রাখলে অমঙ্গল হবে তাদের, অমঙ্গল হবে টিয়ারঙের।

চ্যাটার্জি তবু সম্মতি জানাতে রাজী হল না।

ক্রমশ চেহারা বদলে গেল মাধোর। সমস্ত শরীর রাগে অপমানে কেঁপে উঠল তার। ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে।

রক্তচক্ষু হেনে একবার চ্যাটার্জির দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলেই হাত তুলে হুকুম দিল মাধো। —লাগায় দে, লাগায় দে আগুন।

পরমুহূর্তেই বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। বুকে হাত দিয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল মাধো সর্দার।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে। বিমূঢ় বিস্ময়ে চ্যাটার্জির বন্দুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ছুটে পালাতে শুরু করল তারা।

শুধু আকাশী আর ফিরুজা ছুটে এসে মাধো সর্দারকে তুলে ধরবার চেষ্টা করল।

দু-হাত রক্তে ভরে গেল আকাশীর।

রক্তাক্ত দুটি হাতের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল আকাশী। লুটিয়ে পড়ল বাপের বুকের ওপর।

ছয়

দু-পক্ষই রীতিমত ভয় পেয়ে গেল।

টিয়ারঙীরা প্রাণ হাতে নিয়ে পালাল, প্রাণ হাতে নিয়েই ফিরে এল চ্যাটার্জি, অমিয়বাবু, পাঠকের দল।

চ্যাটার্জির বাংলোর বাগানে এসে বসল সকলে। পরামর্শ শুরু হল।

সকলেই উত্তেজিত, সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত চ্যাটার্জি নিজে। ঠিক এমনটা হবে, এমন একটা ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাবে তা চ্যাটার্জি ভাবতে পারেনি। উত্তেজনার কুক্ষণে সত্যিই মাধো বুড়োকে গুলি করে বসে চ্যাটার্জি যেন আরো উত্তেজিত বোধ করল।

তখনো থরথর করে সারা শরীর কাঁপছে। নিজের অন্যায়, নিজের ভুল যত বেশি করে অনুভব করল, ততই যেন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইল যে সে যা করেছে ঠিকই করেছে। এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

চ্যাটার্জির স্ত্রী তাপসী ছুটে এল খবর শুনে। তামসীর কাছ থেকে সব শুনে আশঙ্কায় আতঙ্কে কেঁদে উঠল তাপসী।

ছুটে এসে বললে, হ্যাঁ গো তুমি নাকি বুড়োটাকে গুলি করেছ? একি করলে তুমি?

দু-চোখ জলে ভরে এল তার।

তামসীও দূরে দাঁড়িয়ে ছিল স্থির হয়ে। সমস্ত মুখ তার থমথমে।

দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল চ্যাটার্জি। তাপসীর কান্না আর কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল। ভাবলেশহীন মুখে একবার তাপসীর দিকে একবার তামসীর দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় স্ত্রীকে সরে যেতে বললে।

তামসী দিদিকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

তাপসী চলে যাওয়ার পর পাঠক বললে, স্টিফেন্স সাহেবকে এ হপ্তার জাহাজেই খবর পাঠিয়ে দিন চ্যাটার্জিসাব।

অমিয়বাবু বাধা দিলেন।—না, না, এ সব ছোটখাটো খবর স্টিফেন্স সাহেবকে জানিয়ে কি হবে। ও সব ঠিক হয়ে যাবে দুদিন গেলেই।

সত্যিই তো। টিয়ারঙের একটা বুড়োকে গুলি করেছে, সে আর এমন কি খবর। দু-দশদিন একটু সাবধানে থাকলেই চলবে। লোকগুলো না খুনিয়া নিয়ে গাছের আড়ালে ওত পেতে বসে থাকে।

তারপর সময়ে সব ভুলে যাবে ওরাও। আবার কাজ করতে লেগে যাবে নগদ পয়সার লোভে। এমন অনেক দেখেছেন অমিয়বাবু। পেটে ভাত না জুটলে, আর হাতে পয়সা পেলে সব রাগ জল হয়ে যাবে।

কোম্পানির কুলিদের হুকুম দিলে পাঠক, দিনরাত পাহারা দিতে হবে বাবুবাংলো।

কিন্তু আশ্চর্য, পরের দিনই যথাসময়ে কাজে এসে যোগ দিল টিয়ারঙের অধিবাসীরা। প্রতিদিনের মতোই এসে দাঁড়াল ফিরুজা। এল মদ্‌না, এল সবাই।

একটা রাতেই মেরুদণ্ড নুয়ে পড়েছিল চ্যাটার্জির। সকলকে কাজে আসতে দেখে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ফিরুজাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলে।

বললে, মাধো বুড়োর একটা মেয়ে আছে না?

ফিরুজা মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, না রে বাবু, ও বাচ্চা মেয়েটার দিকে আঁখ দিবি না আপনি।

চ্যাটার্জি কড়া চোখে তাকাল ফিরুজার দিকে। বললে, কি নাম তার?

—আকাশী বলি আমরা। ওর বুড়া বাপটাও আকাশী বলত।

চ্যাটার্জি বললে, ওকে কাল ডেকে আনবি আমার কাছে। ওকে টাকা দেব আমি, অনেক টাকা।

—টাকা? কেন রে বাবু? তুই টাকা দিলে যে বদনামী হবে মেয়েটা।

চ্যাটার্জি বললে, ওর বাপ মারা গেছে আমার বন্দুকের গুলিতে, তাই ক্ষতিপূরণ দেব তাকে।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ তুলে তাকাল ফিরুজা। যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা। রেগে গিয়ে যাকে খুন করেছে লোকটা, তার মেয়েকে আবার টাকা দেবে? কেন?

মানুষকে মেরে ফেললেই তো সব শেষ হয়ে গেল, তার আবার ক্ষতিপূরণ হয় নাকি? টাকা দিয়ে সে ক্ষতি কমানো যায়? আর তা করবেই বা কেন।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে আকাশীকে ডেকে আনার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে চলে গেল ফিরুজা।

চ্যাটার্জির মনটা হালকা হল। ঠায় তাকিয়ে রইল সে সামনের রাস্তাটার দিকে—যে রাস্তাটা সমুদ্রের বুকে-বাঁধা গ্যাংওয়ে থেকে এঁকেবেঁকে বাবুবাংলোর পাশ কাটিয়ে বনের পথ ধরেছে সেই রাস্তার দিকে।

দেখলে, প্রতিদিনের মতোই দলে দলে কাজে চলেছে টিয়ারঙের অধিবাসীরা। কাঁধে কুড়ুল নিয়ে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলেছে পুরুষগুলো, মেয়েগুলোর পায়ের ছন্দ কাঁপছে তালে তালে।

মেয়েপুরুষ সবাই বনের ভেতর নির্দিষ্ট এলাকায় এসে দাঁড়াল। পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, কিন্তু কেউই কোনো কথা বলল না। ওভারসিয়ার পাঠক নতুন দাগা দেওয়া গাছগুলো দেখিয়ে দিল, কুড়ুলের পর কুড়ুল পড়ল গুঁড়ির গায়ে।

চার চাকার টানা ট্রলীতে করে একে একে কাটা গুঁড়িগুলো সমুদ্রপাড়ের আড়ত-গোলার দিকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল মেয়েগুলো।

কিন্তু মুখচোখ দেখে বেশ বোঝা গেল মনের ভেতর যেন বারুদের স্তূপ জমা হয়ে আছে। যেন যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়ে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে।

এদিকে সূর্য উঠল মাথার ওপর, বাড়ল রোদের তাত। দুপুরে ঘণ্টা পড়তে ওভারসিয়ার পাঠক চলে গেল বাড়ির পথ ধরে। সঙ্গে-আনা কুলিমজুরের দলও ছুটল কোয়ার্টারের দিকে। আর টিয়ারঙীরা এসে জটলা পাকিয়ে বসল।

গামছা খুলে পাখার মতো হাওয়া করতে করতে মেয়েপুরুষ সবাই ঘর থেকে বয়ে আনা পান্তাভাতের থালা নিয়ে বসল। হাঁড়িয়ায় দু-এক চুমুক দিয়ে নিল মেয়েগুলোও।

ফিরুজা এক চুমুক নেশা করে নিয়ে মদনার পাশে গিয়ে গা ঘেঁষে বসল।

বললে, খুনীবাবুটা আকাশীরে টাকা দিতে চায় রে মাদোন।

—টাকা ? আকাশীরে ? বিস্মিত হয়ে তাকাল মদনা ফিরুজার মুখের দিকে।

তারপর দূরে, আকাশী যেখানে ছিল এতক্ষণ সেদিকে তাকাল।

আকাশী ততক্ষণে উঠে গেছে আল্ভার কাছে।

এ সময়টায় প্রতিদিনই তার রাবা হাতে নিয়ে আসে আল্ভা। এসে গাছের একটা গুঁড়িতে েস দিয়ে বসে গান গায়। কাজের াকে এইটুকু বিশ্রামের মধ্যে আল্ভার গান যেন সকলের ক্লান্তি র করে।

গামছায় ভাতের থালা বেঁধে আনত আকাশী বুড়ো মাধোর জন্যে। ার থেকে কিছুটা ভাগ দিয়ে আসত সে আল্ভাকে। আর যেদিন ভাব হত চালের, সেদিন আর পাঁচজনে ভাগাভাগি করে খেতে দিত আল্ভাকে।

আকাশী কোনো কোনোদিন হয়তো অনুযোগ করত, আল্ভাকে বলত কোম্পানির কাজ নিতে।

হাসত আল্ভা। রাবা দেখিয়ে বলত, ভগবানের কাজ নিয়েছি, আমার কি আর ভয়ডর আছে রে আকাশী।

আকাশী রেগে যেত সে-কথা শুনে। রাগে দপ্দপ্ করে পা ফেলে এসে বসত দলের মধ্যে।

আবার কোনো কোনোদিন আল্ভার কাছেই গিয়ে বসত নিরিবিলিতে।

সবাই লক্ষ্য করত, সবাই বুঝত, কিন্তু কেউই কিছু মনে করত না। পাগ্লা মানুষটাকে যদি ভালো লেগে থাকে আকাশীর, আপত্তি করবে কেন তারা।

ফিরুজার কথা শুনে আপনা থেকেই মদ্নার চোখদুটো আকাশীকে খুঁজল যেন।

না, আকাশী ততক্ষণে ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আল্ভার

কাছে। হেসে হেসে কি যেন বলছে।

সেদিকে তাকিয়ে ফিরুজা আর মদনা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল। যাক্, বুড়ো বাপের মৃত্যুর শোকটা তাহলে মুষড়ে দেয়নি মেয়েটাকে।

ফিরুজা হেসে বললে, পাগলাটারে মনে ধরছে আকাশীর।

—হুঁ। হাসলে মদ্না।

কিন্তু পাগল মানুষই বটে আল্ভা।

কাজকর্ম করবে না, ঘর বাঁধবে না। সারাটা জীবন হাতের রাবা বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়েই যেন কাটাতে চায়।

কোনো কোনোদিন হঠাৎ খেয়াল হয়, দাগ টানা একটা পুরনো ময়লা কাগজ, অর্ধেক তার ছিঁড়ে গেছে, সেটাই মাচার তলা থেকে বের করে কুর্তার পকেটে নিয়ে বেরোয়। এক একবার খোলে সেটা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, তারপর পায়ের শব্দ পেলেই চট্‌পট্‌ ভাঁজ করে লুকিয়ে ফেলে।

মনে মনে স্বপ্ন দেখে গুপ্তধনের।

ডিঙি নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যেতে হবে গঞ্জে। তারপর দিনের পর দিন বন জঙ্গল হেঁটে পার হয়ে মগদের দেশে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটুকু।

মাটির তলায় সেখানে নাকি ঘড়া ঘড়া মোহর পুঁতে রেখে গেছে আল্ভার কোন এক পূর্বপুরুষ।

কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ দু-একবার ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল আল্ভা।

দু-তিনদিন এক নাগাড়ে ডিঙি বেয়ে, 'মাটি'তে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু সেই ঘন বন আর নির্জনতা দেখে সাহস পায়নি সে এগিয়ে যেতে। ভয়ে ভয়ে ফিরে এসেছে আবার। ভেবেছে অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে আবার রওনা হবে। কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। দু-একবার বলে দেখেছে টিয়ারঙের লোকগুলো হেসে ওঠে ওর কথা শুনে। বলে, পাগল।

আল্‌ভার নিজেরও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সত্যিই পাগল নয় তো সে? কই, তার গুপ্তধনের কথা তো আর কেউ বিশ্বাস করে না।

স্টিফেন্স সাহেব প্রথম যেবার এসে পয়সা ছড়িয়ে দিয়েছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল লোকগুলো। অথচ, তার ঘড়া ঘড়া মোহরের লোভ নেই কারো?

ফিরুজাও হেসেছে আল্‌ভার কথা শুনে। বলেছে, তোমার নাগালে এমন সোনা, তুমি সোনার তরে পাগল হও কিসে?

সত্যিই তাই, আল্‌ভার নাগালের মধ্যে এত সোনা আসে যায়, সেদিকে চোখ নেই তার। মাটির নীচে যে সোনা লুকিয়ে আছে সেই সোনাই চায় আল্‌ভা।

আকাশীর দিকে তাই প্রথম প্রথম ভালো করে ফিরেও তাকাত না আল্‌ভা। টিয়ারঙের কেউই ফিরে তাকাত না আকাশীর দিকে।

অমন নরম নরম চোখ-ছলছল মেয়েকে মেয়েমানুষ বলেই মনে হয় না যেন। বড়ো ঠাণ্ডা, উত্তাপ নেই যেন। গরম রক্তের মানুষগুলোর কাছে যত আকর্ষণ পুরুষালি চেহারার শক্ত সমর্থ মেয়েগুলোর। ফিরুজার মতো যারা হাসতে হাসতে ছোবল দিতে পারে, যারা রাগলে খুনিয়া বাগিয়ে ধরে।

আকাশী একেবারে অন্য মানুষ। লাজুক লাজুক মুখ, চলে তো

শব্দ হয় না পায়ের, হাসে তো শব্দ হয় না।

ভোরে মা [illegible]ই এসে দাঁড়ায় আল্‌ভার ঘরের সামনে, খুঁটি ধরে দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলে। গান শোনে।

জ্যোৎস্না রাতে কোনোদিন হয়তো দূরে কোথাও বসে গান গায় আল্‌ভা :

দুলতে দুলতে আসল বান
আমি কুডায় পেলাম সোনাব চাঁদ
এ চাঁদটি কাদের
কপাল ভালো যাদের ·····

গলা ছেড়ে গান গায আল্‌ভা। আব তা শুনে ছুটে আসে আকাশী। দূবে দাঁডিয়ে দাঁডিযে শোনে।

কিন্তু বাপ মাবা যাবাব পব হঠাৎ যেন ঘনিষ্ঠ হযে উঠল আকাশী। আশ্রয খুঁজল যেন।

কি আশ্রয় দেবে আল্‌ভা। তাব নিজেবই তো নেই চালচুলো।

তাই আকাশীর ভাবভঙ্গী দেখে হাসল বটে ফিকুজা আব মদ্‌না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বক্ত গবম হযে উঠল চ্যাটার্জিব ওপব আক্রোশে।

ফিস্‌ফিসানি থেকে চাপা গুঞ্জন উঠল টিয়াবঙীদেব দলে। বাগে সমস্ত শরীব যেন জ্বলে ওঠে থেকে থেকে।

আনমনেই খোঁপা থেকে খুনিয়াটা ফিকুজাব হাতে নেমে আসে।

পবমুহূর্তেই তাপুদিদিব মুখটা চোখেব সামনে ভেসে ওঠে তাব।

ধীরে ধীবে খুনিয়াটা আবাব খোঁপায় গুঁজে বাখে সে।

এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হবে, কিন্তু কি করে তা সম্ভব খুঁজে পায না কেউ। মাছ ধরাব মবশুম নয় এটা, চাষবাসেবও সময় নয়।

তা না হলে কোম্পানির লোকদের তাড়িয়ে দিতে ভয় পেত না তারা। শুঁটকি মাছ বেচে এলে দিন কেটে যেত।

আবার ঘণ্টা বাজল।

নিজের নিজের কাজে মন দিল সবাই। কুড়ুলের পর কুড়ুল পড়ল সেগুনের গুঁড়িতে।

চার চাকার ট্রলী মাল বোঝাই করে টানতে শুরু করল মেয়েরা।

এমন সময় হঠাৎ ওভারসিয়ার পাঠকের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল সকলে।

ফিরে তাকিয়ে সবাই দেখলে, আকাশীকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওভারসিয়ারবাবু।

আকাশী হাত ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে গেল পাঠকের দিকে। জালি ওড়নায় মুখের ঘাম মুছে কাছ গিয়ে দাঁড়াল সে।

কি যেন কথা হল দুজনে।

এদিক ওদিক একবার তাকালে আকাশী, তারপর পাঠকের পিছনে পিছনে সে হাটতে শুরু করল।

স্থানুর মতোই সকলেই দেখলে, দাড়িয়ে রইল।

শুধু দাতে দাত চেপে ফিরুজা বললে, বেইমান।

ওদিক থেকে আরেকটা মেয়ে চিৎকার করে ডাকলে, আকাশী।

আকাশী ফিরে দাঁড়াল।

মেয়েটা খোঁপা থেকে খুনিয়াটা খুলে ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

মুচকি হেসে খুনিয়া তুলে নিয়ে পাঠকের পিছনে পিছনে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে গেল আকাশী।

সাত

পরের জাহাজে এল আরো একজন।

প্রতিবারের মতোই বাবুবাংলোর সবাই এসে ভিড় করল গ্যাংওয়ের ওপর। শহরের ইস্কুলে পড়ে চ্যাটার্জির ছেলে, ছুটি পেয়ে বাপ-মার কাছে এসেছে নতুন লোকটির সঙ্গে।

গ্যাংওয়েতে তাকে দেখতে পেয়েই তাপসী ছুটে গেল। দু-হাত বাড়িয়ে হাসি হাসি মুখে তাকে জড়িয়ে ধরে কোলে নেবার চেষ্টা করলে। পারল না।

একমুখ হেসে বললে, কত বড়ো হয়েছিস মণ্টু, তোকে আর কোলে নেওয়াও যায় না।

মণ্টুও মাকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে হাসল।

তামসী কিন্তু তখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নবাগত মানুষটির দিকে।

চ্যাটার্জির সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে করতে এগিয়ে এল সে, হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলে অমিয়বাবুর সঙ্গে।

চমৎকার সুন্দর চেহারা, মাথায় একরাশ হালকা চুল উড়ছে বাতাসে। হাবভাব, চালচলন পুরোদস্তুর সাহেবী। আর চোখেমুখে সপ্রতিভ ভাব, অনর্গল কথা।

আপনা থেকেই তার চোখের দৃষ্টি যেন তামসীর মুখের ওপর এসে পড়ল। চ্যাটার্জি হেসে বললে, আমার শ্যালিকা।

দুজনে দুজনকে নমস্কার করলে।

তামসী জিগ্যেস করলে, আপনি বুঝি···

—হ্যাঁ, তোমাকে বলেছি বোধ হয়, ইনিই সমীরণবাবু।

সমীরণ হেসে পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করল। চ্যাটার্জির দিকে সেটা বোতাম টিপে এগিয়ে দিল, তারপর নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, যাক্ ভরসা হল, বনবাস না তাহলে। আপনারা আছেন যখন···

চ্যাটার্জি হেসে বললে, না বেশিদিন নয়, তামসীর চলে যাবার ডাক এসে গেছে।

—সে কি? চমকে ওঠার ভান করলে সমীরণ। —না, না, সে হতেই পারে না।

বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে তামসীর দিকে। তামসী প্রথমটা একটু ইতস্তত করে মৃদু হেসে হাত বাড়াতে বাধ্য হল।

তামসীর হাতটা চেপে ধরে সমীরণ বললে, কথা দিন, এখন কিছুদিন অন্তত থেকে যাবেন।

তামসী উত্তর না দিয়ে হাসল শুধু, তারপর এপাশ-ওপাশ তাকাতেই দেখলে, একটু দূরেই সৌমেন কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

চোখোচোখি হতেই দ্রুতপায়ে গ্যাংওয়ে থেকে নেমে গেল সৌমেন।

আর সমীরণ তামসীর সঙ্গে, তাপসীর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাংলোর পথ ধরলে।

সমীরণ মন্টুর একটা হাত ধরে নামতে নামতে তাপসীকে বললে, আপনার পুত্রের সঙ্গে এই জাহাজের কদিনেই কিন্তু খুব ভাব হয়ে গেছে।

মন্টু কেন, ভাব হতে কারো সঙ্গেই বাকী রইল না সমীরণের।

স্বতঃস্ফূর্ত, সপ্রতিভ। দুদিনের মধ্যেই যেন ঘরের মানুষ হয়ে উঠল সমীরণ। টিয়ারঙের বাবুপাড়ায় নতুন প্রাণ এল। নীরস নির্জন

দ্বীপটাকে হঠাৎ যেন নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

কোম্পানির কুলিকামিন থেকে শুরু করে বাবুদের বাড়ি পর্যন্ত সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। সর্বত্র সমান সমাদর।

সকলে বেশ অনুভব করল এতদিনে একটা লোক এসেছে যে কাজকে কাজ মনে করে না।

কর্মচারীদের সুখ সুবিধে দেখবার জন্যে, কুলিদের অভাব অনটনে সাহায্য করবার জন্যে এল সমীরণ।

স্টিফেন্স অ্যাণ্ড কোম্পানির এল ডব্‌লু ও সমীরণ সরকার। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম।

হাত-গোটানো সার্ট, দামী কাপড়ের ট্রাউজার্স। ঠোঁটে সব সময় সিগারেট চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। আর না হেসে যেন কথা বলতে পারে না।

তাপসী দেখে আর আড়ালে বলে, কী ছটফটে ছেলে বাপু, তামসী!

তামসীও হাসে।

সত্যি, এত চঞ্চল মানুষ কি করে হয়। কি করে শরীরে পোষায়। এক জায়গায় এক মিনিট স্থির হয়ে বসে না। বসতে পারে না। কেবলই ছুটোছুটি করে।

তখনই হয়তো এসে ঢুকেছে, জানলাটা দড়াম করে খুলে গেল বাতাসে। তাপসী জানলাটা আবার বন্ধ করতে করতে বললে, দেখ সমীরণ তোমাদের কোম্পানির ঘরদোর, জানলায় খিল নেই।

—দেখ্‌ছি আমি। তিড়িং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সমীরণ। সটান চলে গেল ওভারসিয়ার পাঠকের কাছে।—এখনই লোক পাঠান পাঠকসাহেব।

প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ করত তাপসী। ভাবত শুধু তাদের জন্যেই বুঝি সমীরণের এত উৎসাহ।

দেখলে, তা নয়। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে, কুলিরা কেউ হয়তো বললে, ছাদ দিয়ে জল পড়ে। তখনই তার ব্যবস্থা করতে ছুটল সমীরণ।

সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে সমীরণের তাড়া-হুড়োর জন্যে চটে। তবু ভালোও বাসে।

কুলিমেয়েগুলো, টিয়ারণ্ডীরা, কেউ বলে বাপ, কেউ ছেলে, কেউ ভাই। সকলের সঙ্গেই একটা না একটা সম্পর্ক।

এতগুলো লোক, একটা খেলার মাঠ নেই? একটা ক্লাবঘর নেই?

উঠে পড়ে লাগল সমীরণ। পাঁচটা কুলির সঙ্গে নিজেই কোদাল হাতে নিয়ে নেমে পড়ল খেলার মাঠ বানাতে। কোম্পানি যা দিয়েছে বা দেবে, বাকীটা চাঁদা তুলে ক্লাবঘর করতে হবে।

চাঁদার ভারে নুয়ে পড়লেও 'না' বলতে পারে না কেউ। সমীরণকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

সঙ্গে সাজ-সরঞ্জামও নিয়ে এসেছিল সে। ব্যাডমিণ্টনের নেট টাঙিয়ে তামসীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল।

—খেলবেন না মানে! এইটুকু জায়গা, পাঁচটা লোক, এখানে ওসব লজ্জাটজ্জা করলে চলবে না। বলে তামসীর হাতে ব্যাট ধরিয়ে দেয় সমীরণ।

তাপসীর যদিও মনে একবার আপত্তি উঁকি মারে, তবু কিছু আর বলতে ইচ্ছে হয় না। হাসে মনে মনে।

তামসী এসে অনুযোগ করে, কী লোক বাপু তোমাদের ঐ সমীরণবাবু।

—কেন কি হল?

—কী আবার! টেনে নিয়ে গেল খেলবার জন্যে। এদিকে নিজে না খেলে একগাদা লোকের সামনে নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ল কাজ আছে বলে।

সশব্দে হেসে ওঠে চ্যাটার্জি তামসীর কথা শুনে।

ঠাট্টা করে বললে, মনে ব্যথা লেগেছে বুঝি? আহা, এত রূপ তবু ঐ একটা ছোকরাকে......

কটমট করে তাকিয়ে রাগ দেখিয়ে চলে যায় তামসী।

কখনো হয়তো হঠাৎ আবার এসে হাজির হয় সমীরণ। বলে, একটা থিয়েটার করলে কেমন হয় বৌদি?

বৌদি অর্থাৎ তাপসী। তাপসী তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বলে, আমি কিন্তু ওসব করতে পারব না।

চ্যাটার্জি হেসে তাকায় তামসীর মুখের দিকে, জিগ্যেস করে, কি গো, ইচ্ছে আছে নাকি?

সমীরণ বাধা দেয়।—কি যে বলেন মেজদা, ওসব থিয়েটারে চলে না। নায়িকা হব আমি নিজে। দেখবেন কেমন মানায়। মেয়েদের পার্ট মেয়েরা পারে না।

বলেই তোড়জোড় শুরু করে দেয়।

টিয়ারও যেন ভোরের পাখির মতো পাখা ঝেড়ে জেগে উঠতে চায়।

সবারই মুখে শুধু সমীরণ আর সমীরণ।

শুধু একজনের কিছুতেই ভালো লাগে না লোকটাকে। সে বড়ো একটা কাছেও আসতে চায় না। দূর থেকে দেখে। দেখে আর জ্বলে।

সৌমেন।

তামসী যে বুঝতে পারে না এমন নয়। সৌমেনের চোখের দৃষ্টিতে ঈর্ষার জ্বালা দেখতে পায় তামসী, দেখে আর হাসে মনে মনে।

কৌতুক বোধ করে তার ব্যবহারে। আরো বেশি রাগাবার জন্যেই সৌমেনের কাছে কেবলই সমীরণের কথা বলে সে।

এমনভাবে বলে যেন সমীরণের সঙ্গে অন্য কারো তুলনাই হয় না। হয়তো সবটাই অভিনয় নয়, হয়তো বা তামসীর মনের কথাই।

সত্যি, সৌমেনের কাছে বসে থেকে কথা খুঁজে পায় না তামসী। অনেক কিছু বলবার কথা বলা হয় না, অনেক কথা শোনবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু শুনতে পায় না। শুধুই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা, সীমাহীন সময়ের দিকে চোখ মেলে বসে থাকা। অথচ, সমীরণের কাছে কত অনর্গল কথা বলে যায় তামসী, কত সময় কেটে যায় দ্রুত তালে।

এ পরিবর্তন চোখে পড়েছে সৌমেনের। পড়েছে বলেই সেই প্রথম দিন, যেদিন এসে পৌঁছল সমীরণ, যেদিন তামসীর সঙ্গে কথা বলতে দেখল গ্যাংওয়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে, সেদিন থেকেই সমীরণকে যেন সহ্য করতে পারে না সে।

তাই একটু বুঝি এড়িয়ে এড়িয়েই চলছিল সে তামসীকে।

অবহেলা দিয়েই অবহেলার জবাব দেবে ভেবেছিল তামসী।

দিনের পর দিন কেটে যায়। অপেক্ষা করে সে। কিন্তু না, সৌমেনের দিক থেকে কোনো ডাক এসে পৌঁছল না।

মন বেঁধে রেখেছিল সে। কিন্তু যাবার দিনের ডাক এসে পৌঁছল যখন, তখন আর নিজেকে টেনে রাখতে পারল না।

সৌমেনের খোঁজেই একা একা বেরিয়ে পড়েছিল সে। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে একমনে হেঁটে চলেছিল সৌমেন। কোনোদিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

পিছন থেকে চিৎকার করে ডাকলে তামসী।

ফিরে দাঁড়াল সৌমেন।

দেখল। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

অন্যদিন হলে হয়তো ফিরে চলে যেত তামসী।

তামসী ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। সৌমেনের পথ রোধ করে বললে, শোনো।

কোনো জবাব দিল না সৌমেন।

তামসী ঈষৎ হেসে বললে, এরপর যত ইচ্ছে রাগ দেখিও, আজকের দিনটা শুধু—

সৌমেন তখনো কোনো উত্তর দিল না।

তামসী ধীরে ধীরে বললে, কাল থেকে তোমাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না সৌমেনদা, কাল চলে যাচ্ছি আমি।

—চলে যাচ্ছ? কোথায়? চমকে উঠল সৌমেন।

তামসীর হাসিটা বড়ো বিষণ্ণ দেখাল।

বললে, থাকবার জন্যে তো আসিনি সৌমেনদা। চলে যাচ্ছি…

একটু থেমে বললে, হয়তো চিরদিনের জন্যেই। হয়তো আর কোনোদিনই দেখা হবে না।

দু-হাত বাড়িয়ে তামসীর একখানা হাত চেপে ধরল সৌমেন। —না, না, তামসী।

তামসী হাসল। —তা হয় না। তা হয় না। শুধু একটা কথার উত্তর দাও, ভুলে যাবে, একেবারে ভুলে যাবে আমাকে?

তামসীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাকে গাঢ় আশ্লেষে জড়িয়ে ধরতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল সৌমেন।

খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

সশব্দে হেসে উঠল মদ্‌না।

সৌমেন আর তামসী দেখলে, দুজনে দুজনের কোমরে হাত রেখে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে।

ওদের দুজনের সামনে এসে দাঁড়াল ফিরুজা, মদ্‌নার কোমর থেকে হাত না সরিয়েই বললে, আপুনি কাল জাহাজে চল্যে যাবি ছুটদিদি? চল্যে যাবি?

আট

এর আগে কখনো চুরি হয়নি টিয়ারঙে। কিন্তু কে চুরি করল কেউই বুঝতে পারল না।

তামসীর সেদিন চলে যাবার দিন। আগের রাতে জিনিসপত্তর গোছগাছ করে একখানা সিল্কের শাড়ি বাইরে তুলে রেখেছিল সে। যে-শাড়ি পরে প্রথমদিন আনমনে একা-একা বেড়াতে গিয়েছিল গ্যাংওয়ের দিকে। সেই প্রথম দিন, যেদিন ভুল বুঝে ছুটতে ছুটতে এসে তাকে আত্মহত্যার পথ থেকে বিরত করতে চেয়েছিল সৌমেন।

সে-কথা মনে পড়লেই নিজের মনেই হেসে ফেলে তামসী। তখন পর্যন্ত সৌমেন সম্পর্কে সামান্য একটু ঔৎসুক্য ছিল তার, আর কিছু নয়। কিন্তু ভুল বুঝে যেন ভুলের বোঝা বাড়িয়ে দিল সৌমেন।

যাবার দিনে তামসী অনুভব করলে, এই কৌতুক আর কথার হালকা পথেই কখন যেন নিজেরই অজান্তে সৌমেনকে ভালোবেসে ফেলেছে সে।

তেমনি আগের মতোই আবার জাহাজঘাটায় এসে ভিড় করল সকলে।

অমিয়বাবু চলেছেন কোম্পানির আদি মহলে, সেখান থেকে তামসীকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন তিনি।

জাহাজের বাঁশি বাজল। একে একে সকলে গিয়ে উঠল জাহাজে। বদলি-হওয়া বা ছুটি-পাওয়া কুলিকামিন, কর্মচারী, অমিয়বাবু, তামসী।

ছেড়ে যাবার মুহূর্তে দিদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল তামসী, মন্টুকে কোলে নিয়ে আদর জানাল। তারপর জাহাজের রেলিং ধরে হাত

নাড়তে নাড়তে চোখ পড়ল তার সৌমেনের দিকে।

আশ্চর্য, ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সৌমেন। অথচ এতক্ষণ একবার কাছে আসবার, কথা বলবার চেষ্টা করেনি।

সমীরণ যখন তার হাত ধরে বিদায় জানিয়েছে, আবার ফিরে আসবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে, তখন বার বার সৌমেনকে খুঁজেছে তামসী। মনে হয়েছে, সমীরণের মতোই কেন সপ্রতিভ হতে পারে না সৌমেন, কেন এমনিভাবে তার হাতে হাত দিয়ে বিদায় জানাতে পারে না।

দূরে সৌমেনকে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। দু-ফোঁটা অশ্রুও যেন টলটল করল তার চোখের কোণে।

হাত তুলে সৌমেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে বিদায় জানাল তামসী, কিন্তু সৌমেন হাত তুলতে গিয়েও যেন পারল না।

জাহাজ তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেল জাহাজ।

ফিরে এল সকলে।

ফিরে আসতে আসতে সকলের আলোচনা কেন্দ্র করল তামসীর শাড়ি-চুরির ব্যাপারটার ওপর।

কে চুরি করল, কেন?

সমীরণ বললে, এ-চুরির হদিস আমি বের করবই। এ নিশ্চয় কুলিমজুরদের কাজ।

চ্যাটার্জি তার কথায় সায় দিয়ে বললে, তাই মনে হয়। টিয়ারণ্ডীরা প্রয়োজন হলে খুন করতে পারে, কিন্তু চুরি করে না।

ক্রমে ক্রমে চুরির কথাটা টিয়ারঙীরাও শুনল। এ ওর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে। চুরি? টিয়ারঙে চুরি হয়েছে? লজ্জায় মাথা হেঁট করলে সকলে।

মদ্না রেগে গিয়ে বললে, নিমকহারামটার পেট ফাঁসায় দিব হুজুর, খুনিয়া বসায় দিব।

সমীরণ সান্ত্বনা দিল। —আরে না না, তোদের মধ্যে কেউ নেয়নি, নিয়েছে কোম্পানির কুলিমজুরদের কেউ।

খুশি হল মদ্না।

টিয়ারঙীদের একজনকেও যদি সন্দেহ করত বাবুরা, কি ঘটত বলা যায় না। বাবুরা তাদের যে বিশ্বাস করে এইটুকুতেই ফুর্তিতে ভরে উঠল তার মন। আনন্দে টলতে টলতে বনের পথে পা বাড়াল সে। তিতির নয়তো খরগোশ কিছু একটা মেরে আনবার জন্যে।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন। আকাশে এক ফালি বাঁকা চাঁদ।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল মদ্না। না, শিকার মিলবে না এখন। ক্লান্ত-পায়ে বস্তির দিকে পা টেনে টেনে চল্ল।

খানিকটা নেশা করে চাটাইয়ে গা এলিয়ে দিতে পারলে যেন শান্তি।

গাঁয়ের মুখেই আল্‌ভার ডেরা। দূর থেকেই আল্‌ভার রাবা শুনতে পাচ্ছিল। কাছে আসতে গানটা স্পষ্ট হল।

গলা ছেড়ে গাইছে আল্‌ভা :

রে নিঠুর গরজী
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি
সবুর বিহনে ·····

গানের অর্থ সব সময় হয়তো টিয়ারঙীরা বোঝে না, কিন্তু তবু মাথা দোলায় আল্‌ভার সুরে মুগ্ধ হয়ে। শিকারে ব্যর্থ হয়ে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল মদ্‌নার, রাবার সুর আর গলার সুর শুনে চনমন করে উঠল বুকের ভেতরটা।

ধীরে ধীরে ডেরার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। দেখলে, পইঠেতে বসে গান গাইছে আল্‌ভা আর খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে শুনছে আকাশী।

কৌতুকে হাসল মদ্‌না।

তারপর, আকাশীকে দেখেই হয়তো, ফিরুজার কথা মনে পড়ল।

ভাবলে, ফিরুজা কি করছে দেখেই যাই না।

নিজের কুঠির দিকে না গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিল। রতনা মাঝির ডেরার পাশ দিয়ে।

দেখলে রতনা মাঝি তার উঠনের গাছটার গুঁড়িতে জাল শুকতে দিচ্ছে। আর বৌটা তার সুতো কাটছে 'কাঠি' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

দু-তিন ঘর পার হয়ে ফিরুজার উঠন। চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল মদ্‌না। হঠাৎ হোঁচট খেল।

ফিরুজার বুড়ী-মা বসেছিল অন্ধকারে, দেখতে পায়নি মদ্‌না।

গায়ে পা লাগতেই বিড়বিড় করে গাল দিতে শুরু করলে বুড়ী।

মদ্‌না পিঠে হাত দিয়ে মালিশ করার ভঙ্গীতে বললে, আঁধারে লজর হয়নি গো বুড়ী-মা।

বুড়ী মালিশ পেয়ে খুশি হল। বললে, জোয়ান বয়সে বুড়ীটার দিকে লজর-আবে কেনে গো বেটো।

মদ্‌না হেসে বললে, ঠিক কথাটাই বললে বুড়ী-মা। তোমার রাঙা

বেটিটারেই তো খুঁজছি বটে।

বুড়ী পিঠটা বাড়িয়ে বললে, টুকুন ঘস্তে দে ছেলা। বেটিটা পালাবে নাই রে, পালাবে নাই।

মদ্না আরো কিছুক্ষণ মালিশ করে দিতে বুড়ী বললে, ঘরে যা, ঘরে বসে সাজ করছে নিল্লজ মায়াটা।

মদ্না হাসল বুড়ীর কথায়, তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ফিরুজার ঘরের দিকে।

বাইরে থেকে উঁকি দিলে।

পরমুহূর্তেই চমকে উঠল।

টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে ঘরে, ভালো ঠাওর হয় না। কিন্তু সেইটুকু আলোতেই স্পষ্ট দেখতে পেল মদ্না।

দেখলে, শাড়িটা গায়ে ঠিক করে জড়াবার চেষ্টা করছে ফিরুজা। দেখেই বুঝতে পারল মদ্না। ঘাগরা নয়, রীতিমত দামী শাড়ি। মনে পড়ল, একদিন যেন এই শাড়িটাই পরে বেড়াতে বেরিয়েছিল বাবুপাড়ার সেই মেয়েটি।

গলায় লাল প্রবালের মতো মালা ঝুলিয়েছে ফিরুজা, খোঁপায় গুঁজেছে ফুল। নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে শাড়িটা ঠিক করে পরবার চেষ্টা করতে করতে কি একটা গানের কলি গুনগুন করছিল ফিরুজা।

কিন্তু সেদিকে চোখ গেল না মদ্নার। ও শুধু দেখলে, ফিরুজার শরীরে সেই চুরি-যাওয়া শাড়িটা।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত শরীর যেন রাগে কেঁপে উঠল। টিয়ারঙীদের ইজ্জত এমনভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ফিরুজা?

রাগের স্বরেই ডাকলে মদ্‌না।—ফিরুজা!

ফিরুজা চমকে ফিরে তাকাল। তারপর এক মুখ হেসে এগিয়ে এল সে।

—সোন্দর লাগ্‌ছে কিনা বল্‌ মাদোন।

মদ্‌নার দু-চোখ জ্বলে উঠল হাসি দেখে। বললে, বিষ লাগছে তরে। ইজ্জত নাই রে ফিরুজা, বাবুদের সামগ্‌গীর চুরি করছিস্‌?

ফিরুজার মুখ শুকিয়ে গেল। মাথা নীচু করে বললে, তর তরেই তো চুরি করছি। তুই তো কয়েছিলি বাবুদের মায়েটারে বড়ো সোন্দর লাগে। সোন্দর সাজবার সাধ লাগে নাই আমার?

মদ্‌না ধীরে ধীরে বললে, যা, ফিরতি দিয়া আয় বাবুদের, ফিরতি দিয়া পাপ ধুয়ে আয় তুই।

—না। বেঁকে দাঁড়াল ফিরুজা।—কেনে, দিব কেনে ফিরতি, চুরি করছি চুরি করছি। কষ্ট লাগে নাই আমার?

স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মদ্‌না, তারপর বললে, যাঃ তর উ পাপ মুখ আমি দেখব নাই আর।

বলেই ফিরে দাঁড়িয়ে চলে যাবার উপক্রম করল মদ্‌না।

ফিরুজা ডাকলে, মাদোন!

মদ্‌না সাড়া দিল না, রাগে গজগজ করতে করতে বড়ো বড়ো পা ফেলে চলে গেল।

ফিরুজা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর একসময় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক নিঙড়ে। যার চোখে সুন্দর হবার জন্যে পাপ করল ও, সেই চলে গেল রেগে। কি হবে তার সুন্দর সেজে।

চোখে জল এল ফিরুজার। পোশাক বদলে ফেলল ফিরুজা, তারপর শাড়িটা ভাঁজ করে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গিয়ে ফেরত দিয়ে আসবে ফিরুজা। ক্ষমা চেয়ে আসবে।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে চলল সে বাবুবাংলোর দিকে।

বাবুপাড়া তখন নিঃশব্দ। ঘুমে নিঝুম যেন। শুধু দু-একটা বুনো পাখির ডাক, আর সমুদ্রের সঙ্গত বেজে চলেছে অবিরাম ছন্দে। ফিকে আলোর আকাশে চিকচিক করে তারার সারি।

ফিরুজা দ্রুত পায়ে এসে পৌঁছল চ্যাটার্জির বাংলোর সামনে। দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে গেছে তখন। বাগানের বেড়ার ফটকটায় এক হাত রেখে আরেক হাতে শাড়িটা বুকে চেপে কি যেন ভাবলে ফিরুজা।

ডাকবে? ডাকবে সে তাপুদিদির নাম ধরে? পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইবে?

হঠাৎ একরাশ লজ্জা এসে জড়ো হল তার মনে। না, না, এমনভাবে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে। তার চেয়ে-----

নতুন বাবুর কথা মনে পড়ল তার। হ্যাঁ, সমীরণ, সমীরণের কাছে গিয়ে শাড়িটা ফেরত দিয়ে আসবে। নতুন বাবু তাদের বন্ধু, টিয়ারঙীদের বন্ধু। বললে বুঝবে মানুষটা, দোষ ধরবে না। বিপদে আপদে বহুবার তাকে দেখেছে ফিরুজা। দেখেছে, কত আপনার জনের মতো সাহায্য করতে ছুটে আসে সে।

ধীরে ধীরে বেড়ার ফটক থেকে হাত তুলে নিয়ে নতুন বাবুর কুঠির দিকে পা বাড়াল ফিরুজা।

সেদিনের কথাটা মনে পড়ল।

ওভারসিয়ার পাঠক যখন আকাশীকে ডেকে নিয়ে গেল, সেদিন ভয় পেয়েছিল ফিরুজা, ভয় পেয়েছিল টিয়ারঙের মেয়েরা। ভেবেছিল, হয়তো মাধো বুড়ো মারা গেছে দেখে মেয়েটাকে পাপের পথে টেনে নিয়ে যাবে বাবুরা।

গঞ্জে যারা ডিঙি নিয়ে শুঁটকী মাছ আর নারকেল ছোবড়ার দড়ি বেচতে যেত তারা ফিরে এসে 'মাটির' গল্প বলত তাদের কাছে। বলত, গঞ্জের মানুষগুলোর নাকি পাপপুণ্য নেই, লজ্জাশরম নেই। সুযোগ পেলেই মেয়েদের ইজ্জত কেড়ে নেয় তারা।

ফিরুজা তার হারানো-স্বামীর কাছেও সে-গল্প শুনেছে। শুনেছে, গঞ্জের কসবীগুলোর পায়ে নাকি টাকা ঢেলে দেয় পুরুষগুলো। টাকার লোভে নাকি কসবী হয়ে যায় মেয়েরা।

তাই প্রথম যেদিন আকাশীকে টাকা দিতে চেয়েছিল চ্যাটার্জি, ভয় পেয়েছিল ফিরুজা। আরো ভয় পেয়েছিল, আকাশীকে পাঠক যখন ডেকে নিয়ে গেল।

কে যেন একটা খুনিয়া ছুঁড়ে দিয়েছিল সেদিন। কৌতুকে হেসে খুনিয়াটা কুড়িয়ে নিয়ে পাঠকের পিছনে পিছনে চলে গিয়েছিল আকাশী।

তারপর চ্যাটার্জির দেওয়া টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল সে।

বাপের জীবনের দাম কিনা কয়েকটা টাকা! নেয়নি আকাশী।

তারপর টিয়ারঙে এল এই নতুন বাবু। হাসি মুখ, রাঙা মুখ।

টিয়ারঙীরা নাম দিলে লতুন বাবু।

সেই নতুন বাবু এসে টিনের ছাদ দিয়ে দিল তাদের ঘরে, দোকান খুলে দিল মসলাপাতির, কাপড়, চুড়ি, জলে-ভাসা সাবানের। যা কিনা

[illegible] লোকে কিনতে পারত। শুধু কি দোকান! নগদ দাম না দিয়েও যাতে ধারে জিনিস পায় তার ব্যবস্থাও করে দিল এই নতুন বাবু।

আর আকাশীকে হালকা কাজ দিল, 'রোজ' বাড়িযে দিল তাব। চ্যাটার্জি অর্থাৎ বড়োবাবুব মতো টাকা দিযে তাব মন কাডতে চাইল না।

না, নতুন বাবুটা মানুষ ভালো।

ধীরে ধীবে সমীবণেব বাংলোব দিকে পা বাড়াল ফিকজা। দূব থেকে দেখতে পেল একটা জানলা খোলা বযেছে, খোলা জানলায আলো দেখতে পেল।

নিঃশব্দ পাযে কপাটেব দিকে এগিযে যেতে যেতে জানলায একবাব উঁকি দিলে।

টেবিলেব ওপব একটা আলো জ্বলছে। টেবিলেব ওপব দু হাতে মাথা গুঁজে বসে আছে তখন সমীবণ।

মন মাতানো বেশ একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল তাব নাকে। প্রথমটা বুঝতে পাবল না ফিকজা। বুক ভবে নিশ্বাস টেনে গন্ধটা কিসেব ঠাওব কবতে চেষ্টা কবলে।

না, ছুটদিদি সেদিন যে-খোশবাই এনে দিযেছিল, তাপুদিদি যেটা তার গায়ে ঢেলে দিয়েছিল তেমন গন্ধ নয।

সে-গন্ধে এমন মন মেতে ওঠে না, গা তেতে ওঠে না।

ফিরুজা ধীবে ধীবে এসে দাঁড়াল কপাটেব সামনে।

টুক্ টুক্ টুক্ টুক্, হালকা হাতে টোকা দিল দরজায।

ভেতর থেকে গম্ভীব গলাব সাডা পেল ফিকজা।—কে?

—আমি গো লতুন বাবু। একটা সলা ছিল তুমার সাথে। খিলখিল করে হাসল ফিরুজা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সমীরণ।

তারপর এসে দরজা খুলে দিল। খুলে দিয়েই চমকে উঠল। —কে ?

—আমি বটি গো, ফিরুজা বটি আমি। খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

সমীরণ তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফিরুজার দিকে। ফিরুজার ছন্দময় সুপুষ্ট শরীরের লোভানির দিকে।

টিয়ারঙের সবচেয়ে সপ্রতিভ মেয়েটাকে এই যেন প্রথম দেখছে সমীরণ। এ-সৌন্দর্য, এই যৌবনের লীলায়িত তরঙ্গের উচ্ছ্বাস যেন প্রথম চোখে পড়ল তার।

ক্রমে ক্রমে চোখের দৃষ্টি বদলে গেল সমীরণের। কৌতূহলের চোখে আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলে উঠল।

কাছে এগিয়ে এল সে, একেবারে ফিরুজার শরীরের কাছে এগিয়ে এসে বললে, এসেছিস্ ?

—হ্যাঁ গো লতুন বাবু, আসতে হল তুমার কাছে। সশব্দে হাসল ফিরুজা, চোখের কোণে দুষ্টুমির কটাক্ষ হেনে।

বললে, দোষটারে খণ্ডন করতে আসছি। ই কাপড়টা চুরি করছিলাম রে বাবু, ই তুদের ছুটদিদির কাপড়। তাপুদিদির যে-বুনটা চল্যে গেল ঐ জাহাজে, তার কাপড় বটে ইটা।

শাড়িটা সমীরণের দিকে এগিয়ে দিল ফিরুজা।

সমীরণ তখনো মোহময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ক্রমে

ক্রমে মৃদু হাসি দেখা দিল সমীরণের চোখে।

বললে, কেন নিয়েছিলি ?

—সাজ করবার শখ নাই আমার ? ই কাপড়টা পরে ছুটদিদিকে সোন্দর লাগল তো ভাবলাম ই টিয়ারঙী মেয়েটারেও সোন্দব লাগবে নাই ক্যানে! তা মাদোনটা রেগ্যে গেল তাই ফিরতি দিতে এলাম গো। তুই ইটা উদের পাঠায় দিবি লতুন বাবু।

হাসল সমীরণ।—কাপড় ফেরত দিতে এসেছিস এত রাতে ?

বলে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল।

টেবিল থেকে বোতল তুলে গ্লাসে ঢালতে শুরু কবলে।

উৎসুক একজোড়া চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার বুক ভরে নিশ্বাস টেনে আঘ্রাণ নেবাব চেষ্টা করলে ফিরুজা।

বললে, বড় মিঠা খোশবাই। কি বটে রে উ পাত্রটা।

সমীরণ হেসে বললে, মদ।

খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

—দেখ্ বাবু, ঠিক কথাটাই ভাবছিলাম আমি। তো ভাবলাম কি আমাদের পচাইটাব খোশবাই ভালো লয়।

—পচাই খাস্ তুই ?

—হ, কত। তা লতুন বাবু, টুকুন দিবি তুদেব পচাইটা। বড়ো মিঠা লাগছে খোশবাইটা।

সমীরণ এদিক-ওদিক তাকাল একটা গ্লাসেব খোঁজে। এক কোণে একটা মাটির ভাঁড় পড়ে ছিল, ফিরুজা সেটা তুলে নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল ভিক্ষার ভঙ্গীতে।

বললে, দে টুকুন।

মাটির ভাঁড়ে ঢেলে দিল সমীরণ।

এক চুমুকে সেটা শেষ করে আবার ভাঁড়টা ধরল ফিরুজা।

আবার ঢেলে দিল সমীরণ।

একটু-একটু করে নেশায় চুর হয়ে গেল ফিরুজা। পা টলতে শুরু করল তার।

—পড়ে যাবি রে। বলে ফিরুজাকে ধরে খাটের এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বসাল সমীরণ।

খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠেই দু-হাত দুদিকে ছড়িয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল ফিরুজা। পরমুহূর্তেই আবার উঠে বসে দেখলে দুটি কামনাতপ্ত চোখে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সমীরণ।

লজ্জার হাসি হেসে দুটি হাত আড়াআড়ি রেখে বুক ঢাকবার-চেষ্টা করার ভঙ্গীতে সমীরণের দিকে তাকালে সে।

সমীরণ বললে, আর খাবি ?

—দে টুকুন। লজ্জিত চোখ তুলে তাকাল ফিরুজা।

আবার ভাঁড় ভরতি করে ফিরুজার হাতে তুলে দিল সমীরণ।

এক চুমুকে সেটা শেষ করে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফিরুজা।

তারপর নাচের ভঙ্গীতে হাততালি দিতে দিতে গান শুরু করলে। আল্‌ভার কাছে শেখা গান :

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে
কোথাকার এক মদন রাজা পানসি বান্ধল ঘাটে
আমি কি করি—

নেশার ঘোরে নাচ আর গান যেন থামতে চায় না তার

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে
চুলের মুইঠা ধইরা রাজা উঠায় নৌকার পরে রে।
আমি কি করি—

গাইতে গাইতে খিলখিল করে হেসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফিরুজা। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে দিতে আবার গাইতে শুরু করে :

আগা লৌকায় ঝামুর ঝুমুর
পাছা লৌকায় ছায়া
ধীরে সুস্থে বাইও লৌকা
আমি পতির ক্রন্দন শুনি রে!
আমি কি করি—

গানের তালে তালে সমীরণও হাততালি দিতে শুরু করে। তা দেখে হেসে লুটোপুটি খায় ফিরুজা। নেশায় টলতে টলতে কখনো সমীরণের বুকের উপর আছড়ে পড়ে।

তারপর কোনোরকমে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে গায় :

কাইন্দ না কাইন্দ না পতি রে
না কান্দিও আর
ঘরে আছে অষ্ট অলঙ্কার
তুমি আরেক বিয়া কইর রে,
আমি কি করি—

গাইতে গাইতে হঠাৎ চুপ করে ফিরুজা।

অনিমেষ চোখে সমীরণের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করে।

সমীরণের উষ্ণ রক্তেও তখন নেশা ধরে গেছে। ধীরে ধীরে ফিরুজাকে কাছে টেনে নেয় সমীরণ। দুটি সবল বাহুর আলিঙ্গনে বুকে টেনে নেয় সে ফিরুজাকে। তার কোমল নারীদেহের যৌবন-ছন্দকে যেন বুকের নিবিড়ে নিষ্পেষিত করতে চায়।

পরমুহূর্তেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে সমীরণ।

হঠাৎ যেন নেশা ছুটে গেছে ফিরুজার। আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ছটফট করেই সমীরণের কাঁধের ওপর শক্ত কামড় বসিয়ে দিয়েছে ফিরুজা।

যন্ত্রণায় বাহুর বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে সমীরণের।

ছিটকে দূরে সরে আসে ফিরুজা।

ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খোঁপা থেকে খুনিয়াটা বের করে শক্ত মুঠোয় ধরে কি যেন ভাবে ফিরুজা। তারপর আবার আস্তে আস্তে সেটা খোঁপায় গুঁজে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠেই ছুটতে শুরু করে।

সমীরণ কপাটের কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখে, ছুটতে ছুটতে চলেছে ফিরুজা। আর দূর থেকে ভেসে আসছে তার খিলখিল হাসি।

নয়

হাঁপাতে হাঁপাতে মদ্‌নার ডেরায় এসে উঠল ফিরুজা। ভরা যৌবনের সুঠাম শরীর তার তখনো কাঁপছে থরথর করে। হয়তো এতখানি ছুটে এসেছে বলে, হয়তো নেশার আবেশে।

মুখে মদো গন্ধের উগ্রতা, চোখের চাউনিতে কেমন এক উন্মাদনা।

উর্ধ্বভাগের ভার বাঁকা কোমরের ওপর ছেড়ে দিয়ে দু-হাত পিছনে রেখে অপরূপ ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়াল ফিরুজা, ঠিক যেখানটিতে শুয়ে ছিল মদ্‌না।

ঘরের উঠনে চাটাইয়ের ওপর দেহ এলিয়ে মদ্‌না একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ ফিরুজার ছায়া-ছায়া চেহারাটার দিকে চোখ গেল তার।

ফিরুজা কাছে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হেসে উঠল।

বললে, কি ভাবছিস্ রে লাগর?

মদ্‌না সাড়া দিল না। ফিরুজাকে সাঙা করবার জন্যে দিনের পর দিন যে-স্বপ্ন দেখেছে সে, আজ হঠাৎ যেন ফিরুজা সে-স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। বিষিয়ে দিয়েছে তার মন। চুরি করেছে ফিরুজা? টিয়ারঙের মানুষ কিনা চুরি করেছে ছুটদিদির শাড়ি?

ফিরুজা ধীরে ধীরে বসে পড়ল মদ্‌নার পাশে। তারপর আবছা অন্ধকারে মদ্‌নার মুখের কাছে তার চোখজোড়া নামিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে মানুষটা সত্যিই ঘুমিয়ে আছে কিনা।

মদ্‌না কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, ফিরায় দিছিস্ উটি? মাফি মেগে লিয়েছিস্ বাবুদের?

—হুঁ।

মদ্‌না চুপ করে রইল। কোনো কথা বললে না অনেকক্ষণ।

ফিরুজা একটা হাত রাখল তার বুকের ওপর।

হাতটা সরিয়ে দিল মদ্‌না। বললে, নেশা লাগছে তর, নেশা করছিস ফিরুজা!

—হুঁ।

মদ্‌নার পাশে শুয়ে পড়ল ফিরুজা। নাঃ, লোকটার রাগ ভাঙাতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে অস্ফুটে ডাকলে, মাদোন।

—উঁ। ঘুম-ঘুম চোখে সাড়া দিল মদ্‌না।

ফিরুজা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। ধীরে ধীরে বললে, বিয়াসাঙাটা করবার ইচ্ছা জাগছে রে।

—মিছা কইছিস।

—না রে, মিছা লয়। ইচ্ছার কথাটা কইলাম।

মদ্‌না হাসল। —জবর নেশা লাগছে তর।

হঠাৎ উঠে বসল ফিরুজা। —নেশা লয় রে, নেশা লয়। কথাটা বলবার জন্যে কথা খুঁজল ফিরুজা। একমুহূর্ত কি যেন ভাবল। বড়ো ভয় পেয়ে গেছে সে নতুনবাবুকে। মদের নেশায় যে নতুন-বাবুটা শয়তানি করতে চেয়েছিল, সে-কথাটা মদ্‌নাকে না বলতে পেলে যেন শান্তি পাবে না সে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হারাল ফিরুজা।

কি হবে বলে।

হয়তো মদ্‌না চমকে উঠবে।

বলবে, খুনিয়া ছিল নাই? উয়ার পেটটা ফাঁসায় দিলি না ক্যানে?

বেশ তো, সে-কথা যদি বলে ফিরুজা হেসে উঠবে খিলখিল করে। মদ্‌নাকে চটাবার জন্যেই নয় বলবে, খুন চাপে নাই তো খুনিয়া লিয়ে কি করব। বাবুটা বড়ো সোন্দর রে মদ্‌না, বড়ো ভালো উ মানুষটা।

নিজের মনেই হেসে ফেলল ফিরুজা। না, নতুনবাবুর কথাটা বলা চলবে না। মদ্‌নাকে চেনে ও। তাই ভয় হয় বলতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফিরুজা আবার বললে, জবাবটা দে ক্যানে?

—আর তর মানুষটা যদি ডিঙি লিয়ে ফির‍্যে আসে?

ফিরুজা হেসে বললে, উ কি আর বাঁচে আছে রে, উয়াকে সাগরের মাছে খায়ে লিয়েছে।

—হুঁ। শুধু সাড়া দিল মদ্‌না। কোনো কথা বললে না।

কিছুক্ষণ পরে ফিরুজা বললে, পোরভাত হলে খবরটা দিয়া দিব। লতুনবাবুরেও কয়ে দিব।

প্রভাত হতে সত্যিই খবরটা জানিয়ে দিল ফিরুজা, দলের সকলের কাছে। এমন কিছু নতুন খবর নয়। দলের লোক, টিয়ারঙের লোক অনেকদিন থেকেই অপেক্ষা করে আছে এ-খবরের জন্যে।

তারাও ধরে নিয়েছে ফিরুজার স্বামী যম্‌নী জেলে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। হয় ডিঙি উলটে মানুষখেকো মাছের মুখে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তার শরীর, আর নয়তো 'মাটি'র ডাকুডাঙরদের হাতে পড়েছে।

সে কি আর আজকের কথা!

অতশত হিসেবগুস্তি জানে না টিয়ারঙীরা। ঋতুর পরিবর্তনটুকুই বছরের পর বছর তাদের চোখে পড়ে। হ্যাঁ, অনেকবার শীত বর্ষা এসেছে

গেছে তারপর।

যম্‌নী জেলে বেঁচে থাকলে নিশ্চয় এতদিনে ফিরে আসত। ফিরুজার টানে ফিরে আসত একদিন না একদিন। আর নয়তো তার ছেলে বুধার টানে।

হাবেভাবে চলনে বলনে মনে হয় যেন ফিরুজার নতুন যৌবন। তার যে আট বছরের একটা ছেলে আছে, দেখে বোঝা যায় না।

যম্‌নী হারিয়ে যাওয়ার পরেও কিছুদিন বুধা ছিল তার মায়ের কাছে, ফিরুজার কাছে। তারপর অপেক্ষা করে করে যখন ফিরল না যম্‌নী, তখন বুধাকে নিয়ে গিয়ে রেখে এল সে যম্‌নীর বাপের কাছে।

বললে, তুমার পুতের পুত ও, ভাত দিবার কথা তুমার। যম্‌নী ফির‍্যা আসে তো লিয়ে যাব, ডাঙর হলে লিয়ে যাব।

যম্‌নীর বুড়ো বাপ কোনো কথা বলেনি। ছলছল দুটি চোখ চেয়ে তাকিয়েছে ফিরুজার দিকে। সম্মতিতে ঘাড় নেড়েছে।

সত্যি তো, ছেলে তার যখন ফিরল না, তখন ছেলেকে ভাত দেবে কেন ফিরুজা।

কিন্তু বুড়ো নিজেই বা কি করে ভাত দেবে তাকে। গতর খাটিয়ে মাছ ধরার কিংবা চাষ করার সামর্থ্য নেই যে তারও।

তবু কোনোরকমে দিন চলছিল বুড়োর। টিয়ারভীদের সাহায্যে। নাতিটার শক্তি হয়নি কিন্তু দুটো হাত তো আছে।

সারাদিন গাছের ছায়ায় বসে বসে দড়ি পাকায় বুড়ো। একটা দিক ধরে থাকে বুধা, আর নারকেল ছোবড়ার দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে বিক্রি করে আসে সে গঞ্জমাঝিকে। গঞ্জে গিয়ে মাল বেচে আসে যে-মাঝিরা।

সেদিনও এমনি ছায়ায় বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছিল বুড়ো। বুধা বসে ছিল পাশেই।

ফিরুজা তরতর করে এসে দাঁড়াল বুড়োর কাছে।

চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে বুড়োর। ভালো দেখতে পায় না। তবু ফিরুজার কাপড়টা পতপত করল চোখের সামনে। বুঝলে, কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

—কে বটে ? প্রশ্ন করলে বুড়ো।

ফিরুজা উত্তর দিলে, তুমার ছেলার বৌ গো, ফিরুজা বটি।

—ফিরুজা ? মুখে একটু যেন হাসি দেখা দিল বুড়োর।—বুড়াটার কথা মনে আসছে ?

—হুঁ।

অস্ফুট একটা শব্দ করল ফিরুজা। তারপর চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। পায়ের নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, তুমার মতিটা জানতে আসছি কর্তা, মাদোনটারে সাঙা করব মন লাগছে।

চমকে উঠল বুড়ো। ভাসাভাসা দুটি চোখ তুলে তাকাল সে ফিরুজার মুখের দিকে। দুটি চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

ধীরে ধীরে বললে, বুড়া হইছি। দেবতারা ডাকে লিবে যখুন, বুধা বেটাটার কি হব রে ফিরুজা ?

বলে আন্দাজে আন্দাজে বুধার মাথায় গায়ে স্নেহের হাত বোলাতে শুরু করলে বুড়ো।

ছেলের মুখের দিকে তাকাল ফিরুজা। বুধা কিন্তু তার মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল, লজ্জায় নয়তো অভিমানে।

ফিরুজার বুকেও যেন লাগল। ধীরে ধীরে বুধার কাছে বসে

পড়ল ফিরুজা।

আদরের ভঙ্গিতে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, বেটাও আমার, বুড়াও আমার। সাঙা করব ই কথাটাই কয়েছি মাদোনরে। তুমাদের ফেলায় দিব ক্যানে?

কথা শুনে মুখেচোখে হাসি দেখা দিল বুড়োর।

ফিরুজাও হাসল। বললে, বুধাটা আর টুকুন ডাঙর হলে বাবুদের কামে লাগবে, মজুরি মিলবে।

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, তর ইচ্ছাটা যখুন সাঙার পানে গেল, আমি বুড়াটা মানা করব ক্যানে? হোক্ সাঙা, সাঙা হোক্ তর।

হোক্ সাঙা। কথাটা শুনেই যেন ফুর্তির ফুলঝুরি ফুটে উঠল ফিরুজার মুখেচোখে।

হাসিমুখে তরতর করে চলে গেল সে পাকা খবরটা দলের সকলকে জানাতে।

একে একে সব ডেরা ঘুরে সকলকে খবর জানিয়ে আল্‌ভার ঘরের সামনে এসে পৌঁছল সে।

দেখলে উঠনে বসে তাঁত বুনছে আকাশী। এক পাশে একরাশ তুলো, লাটিমভরা রঙিন সুতো কোলে নিয়ে বাঁশের ছোট্ট হাত তাঁতে কাপড় বুনছে আকাশী। টুক টাক টুক টাক শব্দ হচ্ছে, তারই তালে তালে গুনগুন করছে কি একটা গানের কলি।

উঁকি মেরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আল্‌ভাকে খুঁজলে ফিরুজা।

তারপর আকাশীকে বললে, গায়েন ভাই আমার গেল কুথায় রে আকাশী।

চমকে ফিরে তাকিয়ে হাসল আকাশী। চোখের ইশারায় আল্‌ভাকে দেখিয়ে দিল সে।

ফিরুজা দেখল এক কোণে উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে ফুঁ দিচ্ছে আল্‌ভা। কি ব্যাপার। আল্‌ভা, বাউল আল্‌ভা রান্না করছে!

—তাজ্জব করলে গো গায়েন। ঘর ছাড়ে শেষে ঘর বাইন্ধবার মন লাগছে তুমার? খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

আল্‌ভাও হেসে উঠল। বললে, মুখে হাসিটা তোমার বিজলীর মতো চমক দেয় কেন গো টিয়ারানী? খবর আছে নাকি কিছু?

বিদেশী আল্‌ভা 'মাটির' মানুষ। টিয়ারঙে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়েছিল সে ডিঙি নিয়ে। তারপর এই মানুষগুলোকে ভালো লেগে গিয়েছিল তার। তাই এখানেই রয়ে গেছে, মিশে গেছে এদের সঙ্গে। শুধু মুখের ভাষাটাই তার অন্য, কিন্তু মন এক হয়ে গেছে।

স্টিফেন্স সাহেবের মতো আল্‌ভারও প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল এই ফিরুজার ওপর। ফিরুজার নাম দিয়েছিল টিয়ারঙের রানী। তারপর থেকে ফিরুজাকে ঠাট্টা করে টিয়ারানী বলে ডাকে আল্‌ভা।

ঠাট্টা হলেও কথাটা ফিরুজার ভারী পছন্দ।

বলে, রানী তো বটি গো আমি, টিয়ারঙের রানী আমি। দেখ ক্যানে, তুমার আকাশী সোন্দর না আমি সোন্দর।

আল্‌ভা হাসে। বলে, টিয়াপাখিটা ব্যঙ্গ করবার পাখি নয় রে ফিরুজা। ও যৌবনেও সবুজ বুড়া হইলেও সবুজ। ওর মনটা চিরকালটা সবুজই থাকে। কিন্তু চক্ষু মেলে যে তুমারে দেখবার লোক নাই।

—তুমি তো আছ গো গায়েন ভাই। তুমি দেখলেই আমার মনটা

সবুজ রইবে। হেসে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলে ফিরুজা।

আল্‌ভা হেসে বলে, উহুঁ। আমার হাতে খুনিয়াও নাই, আমার হাতে কুড়ালও নাই। রাবা নিয়ে তোমার মানুষটার সাথে যুদ্ধ লড়তে পারব না আমি।

কথা শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে ফিরুজা।

বলে, মানুষটা বাঁচে নাই গো, বাঁচে নাই। তাই তো বুড়ার কাছে মতি জানে আলাম, মাদোনরেই বিয়াসাঙা করে ঘর বাঁধব মন করেছি।

—হুঁ? সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল আল্‌ভা।

আকাশীও বিস্ময়ের চোখে তাকাল।

তারপর দুজনেই হেসে উঠল আনন্দে। আর আল্‌ভা ছুটে গিয়ে ঘরের মাচা থেকে 'রাবা' নামিয়ে এনে গান জুড়ে দিলে :

নিশিতে যাইও ফুলবনে, রে মন-ভমরা।
কব কথা প্রাণবন্ধুর কানে, রে মন-ভমরা॥

আকাশীও হাসল আল্‌ভার গান শুনে। কিন্তু ফিরুজার মতো তালে তাল মিলিয়ে সেও গেয়ে উঠল না।

তা দেখে ফিরুজা বললে, তুমার এ মন-ভমরারে বিয়া করে সুখ পাবে না গায়েন। ই মেয়েটার মন বড়ো শীতল।

আল্‌ভা হেসে উঠল সশব্দে, আর আকাশী যেন লজ্জা পেল। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় ফিরুজার। বড়ো ঠাণ্ডা মেয়ে আকাশী। উদাস উদাস ডাগর দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, নিঃশব্দে কাজ করে যায়, কোনো কথা বলে না।

না, কথা বলে না আকাশী। সব কথা যেন গুমরে মরে তার মনের আড়ালে। কি সে-কথা? আল্‌ভা? আল্‌ভার গানের সুর? না

তার মরা বাপের জন্যে বাবুদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ আক্রোশ ?

আল্‌ভা লক্ষ্য করে দেখেছে, বাবুদের কথা উঠলেই হঠাৎ কেমন যেন জ্বলে ওঠে তার দু-চোখ। আব চ্যাটার্জি, টিয়ারণ্ডীরা যাকে বড়োবাবু বলে, সে যখন বস্তির পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে জঙ্গলের পথে শিকার করতে যায় বন্দুক নিয়ে তখন কেমন যেন রহস্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আকাশী। কি এক দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে।

আদবকায়দায়, ভাবে ভঙ্গীতে সমীরণ পুরোদস্তুর সাহেব হলেও টিয়া-রঙের জীবন যেন এক অদ্ভুত উন্মাদনা এনে দিয়েছে তার মনে।

ভয় পেয়ে পালিয়েছিল ফিরুজা। মাতাল পায়ে তাকে ছুটে পালাতে দেখে নেশার ঘোরে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অট্টহাসে হেসে উঠেছিল সমীরণ। নেশা ছুটে গিয়েছিল পরক্ষণেই। প্রথমটা সেও ভয় পেয়েছিল ফিরুজাকে হঠাৎ খোঁপা থেকে খুনিয়া বের করে রুখে দাঁড়াতে দেখে। পরমুহূর্তেই হেসে উঠেছিল সে ফিরুজাকে পালাতে দেখে। কিন্তু হাসিটা মাঝপথেই থমকে গেল। মনের মধ্যে তীব্র এক জ্বালা অনুভব করল। যেন হাতের মুঠো থেকে কামনালুব্ধ পাখিটা উড়ে পালিয়েছে।

নেশায় পাওয়া মেয়েটার সুপুষ্ট শরীরের ছন্দ যেন কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তার শিরায় উপশিরায়।

টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এসে একদৃষ্টে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিল সমীরণের। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় ছুটন্ত নারীর শরীরের ছায়াটা যতক্ষণ দেখা গিয়েছিল অনিমেষ তাকিয়ে দেখেছিল সে।

তারপর একাই বেরিয়ে পড়েছিল সমুদ্রতটের দিকে।

এই বিচিত্র পরিবেশ, টিয়ারঙের এই বিচিত্র মানুষগুলো যেন তার শরীরের রক্তে উষ্ণতা ঢেলে দিচ্ছে। বেবল্গা এই আদিম বন্যতার জীবনে কি এক আকর্ষণ আছে, কি এক উন্মাদনা।

টলতে টলতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ায় সমীরণ। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় মনে হয় যেন পৃথিবীর চঞ্চল জীবন

থেকে ছিটকে হারিয়ে গেছে সে। হারিয়ে গেছে নির্জন দ্বীপের নিঃশব্দতায়।

যতদূর চোখ যায় জল আর জল। সীমাহীন সমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গোচ্ছ্বাস। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে বালিতটের ওপর। আর পিছনে ঘন অরণ্য। শাল সেগুনের অন্ধকার রহস্যময় বীভৎস বনের আতঙ্ক। ছোট্ট এইটুকু দ্বীপ টিয়ারঙ, তবু রাতের অন্ধকারে মনে হয় অসীম রোমাঞ্চের স্তব্ধতা। বন আর বন। উঁচুনীচু অসমতল পাথুরে মাটিও ঢেউয়ের মতোই এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেছে দূরের পাহাড়ে। দ্বীপের পুব দক্ষিণের সমস্ত সীমারেখাটা দিকচক্রবালের গায়ে একটা নারীর শায়িত শরীরের মতো পড়ে আছে। নারীর শরীর নয়, এক সারি অনুচ্চ পাহাড়।

সেই পাহাড়ের গা বেয়ে, বনের ভিতর দিয়ে বর্ষার সময় একটা ঝরনাধারা এসে পড়ে সমুদ্রে। বৃষ্টির জল জমে জমে জেগে ওঠে একটা বর্ষার নদী। ডিঙিতে চড়ে সে-সময় পারাপার করে টিয়ারঙীরা। লগি ঠেলতে ঠেলতে চলে মেয়েগুলো। ডিঙি বেয়ে কাজ করতে যায় কোম্পানির কুঠিতে। আবার গ্রীষ্মের সময় নালাটা শুকিয়ে যায়, আল্‌ভার কপালের কাটা দাগটার মতো শুধু একটা সরল স্মৃতিচিহ্নের মতো পড়ে থাকে খালটা।

এই খালের ধারে ধারে একটা পায়ে চলার পথ এগিয়ে গেছে টিয়ারঙীদের বস্তির দিকে। এই পথ বেয়েই ছুটে পালিয়েছিল ফিরুজা।

সমীরণ এসে দাঁড়াল এই খালের ধারে।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে তখন। একরাশ পুঞ্জীভূত মেঘ ছুটে আসছে দ্রুতবেগে। কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল সমস্ত

আকাশ।

দূরে, অনেক দূরে শুধু টিম্‌টিম করে জ্বলছে টিয়ারঙীদের বস্তির আলো। এদিকের কোম্পানি মহল একেবারে নিঝুম।

চুপ করে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সমীরণ। একাকিত্বের জীবন যেন দুঃসহ হয়ে উঠছে তার কাছে। এক একসময় তামসীকে মনে পড়ে যায়। নির্জন দ্বীপের বুকে এক টুকরো সঙ্গ। নিঃশব্দ দ্বীপের বুকে এক টুকরো শব্দ। তামসীকে ঘিরে মনে মনে কত না রোমাঞ্চ বুনেছে সে।

একটি নারীর সঙ্গ পাবার জন্মে, একটি উষ্ণ শরীরের কোমল স্পর্শ পাবার জন্মে যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে সমীরণ। ইচ্ছে হয় টিয়ারঙের বন্য আদিমতার মধ্যে ডুবে যেতে, হারিয়ে যেতে।

ফিরুজা। ফিরুজার সমর্থ শরীরের মাংসল ছন্দের মোহমদির আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সে। ন্যায় অন্যায়, পাপপুণ্য নয়। আদিম কামনার আগুন জ্বলে উঠেছে তার শরীরে, মনে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পিছন থেকে, বহু দূর থেকে একটা গুনগুনুনি ভেসে এল বাতাসে।

চমকে ফিরে তাকাল সমীরণ।

গানের সুর লক্ষ্য করে দেখলে, দূর থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে।

অপেক্ষা করল সমীরণ। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল গানের সুর, অস্পষ্ট একটা ছায়া এগিয়ে এল।

আল্‌ভা। কি একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে আসছে। আর তার পাশে পাশে আকাশী।

আল্‌ভা কাছে আসতেই সমীরণ প্রশ্ন করলে, কোথায় চলেছ

আল্‌ভা ?

আল্‌ভা থমকে দাঁড়াল। বললে, মেঘ দেখছেন না নতুনবাবু। পানি নামবে ঘোর হয়ে। সমুন্দুরে জোয়ার আসবে।

—হুঁ! তা তুমি কোথায় চলেছ? পরক্ষণেই আকাশীর দিকে চোখ পড়ল সমীরণের। বললে, ওটি কে? কি রে মেয়ে, আবার আড়ালে লুকচ্ছিস কেন? হেসে উঠল সমীরণ।

কথা শুনে আরো লজ্জা পেল আকাশী, আরো বেশি করে লুকবার চেষ্টা করল আল্‌ভার পিঠের আড়ালে।

আল্‌ভাও হেসে উঠল।—বড়ো শরম বাবু আকাশীর, বাবুদের বড়ো ডর পায় ও।

একটু থেমে বললে, ডিঙিটা ভালো করে বাধা রয়েছে কিনা দেখে আসছি নতুনবাবু, চলেন কেন ডিঙিঘাটকে।

সমীরণ আকাশীর দিকে এক চোখ দেখে নিয়ে বললে, চল। কিন্তু তোমার আবার ডিঙি আছে নাকি আল্‌ভা?

—আছে হুজুর। ডিঙি না হলে মাটিকে যাব কেমন করে বাবু।

আলভার পাশে সমীরণও তখন চলতে শুরু করেছে।

চলতে চলতেই আল্‌ভা হঠাৎ বললে, আপনারে একটা গোপন কথা বলব হুজুর, কইবেন না অন্য কারেও।

—না বলব না। কি কথা?

আল্‌ভা ইতস্তত করে বললে, ডিঙিটা রাখছি হুজুর মাটিতে যাবার লেগে। আপনার ইস্টিমারে আমারে একবার মাটিতে লয়ে চলেন না বাবু।

সমীরণ হেসে বললে, কেন, মাটিতে কি হবে?

এপাশ-ওপাশ তাকাল আল্‌ভা। কেউ আছে কিনা। কেউ না শুনতে পায়। ঠিক যেভাবে সতর্কতার সঙ্গে একদিন সৌমেনকে বলেছিল, সেইভাবে চাপা গলায় বললে, মাটিতে সোনা আছে হুজুর, মাটিতে সোনা আছে।

বুঝতে না পেরে হাসল সমীরণ।

আল্‌ভা আবার বললে, কথাটা গোপন রাখবেন কর্তা, কেবল আপনারেই কইছি।

—কি গোপন কথা আল্‌ভা, বল, খুলেই বল। উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল সমীরণ।

আল্‌ভা ফিসফিস করে বললে, আমার কাছে একটা নকশা আছে হুজুর·········

—নকশা ?

হ্যাঁ, একটুকরো কাগজ, মানচিত্রের মতো আঁকজোক তার গায়ে। মগদের দেশ পার হয়ে কোন গঞ্জের কাছে মাটিতে নাকি ঘড়া ঘড়া হীরে জহরত সোনার মোহর পুঁতে রেখে পালিয়ে এসেছিল তাদের পূর্বপুরুষ। সেই নকশাটা পেয়েছে আল্‌ভা তার বাপের কাছ থেকে, তার বাপ পেয়েছিল আল্‌ভার বড়ো বাপের কাছে। কোনোরকমে মাটিতে পৌঁছে এই নকশা দেখে দেখে ঠিক জায়গাটায় পৌঁছলেই সব ফিরে পাবে আল্‌ভা। আল্‌ভা গরিব নয়, আমির সে। তার মতো ধনী আছে নাকি পৃথিবীতে ?

কিন্তু নকশাটা বুঝতে পারে না আল্‌ভা, পড়তে পারে না কি লেখা আছে নকশার গায়ে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আল্‌ভা বললে, মুখ্যু মানুষ হুজুর, লিখাপড়াটা

শিখায় দেন কর্তা, নকশা দেখে দেখে পৌঁছে যাব।

হাসল সমীরণ। পাগল নাকি লোকটা ?

না, পাগল নয় আল্‌ভা। এই গুপ্তধনের সন্ধানেই ডিঙি নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়েছিল সে। দিক্‌ হারিয়ে টিয়ারঙে এসে পৌঁছেছিল। তারপর কেমন করে যেন আটকে পড়েছিল এই ছোট্ট দ্বীপে। টিয়া-রঙের বাতাসে কি যেন নেশা আছে। একবার এসে পড়লে আর বাইরে যাবার ইচ্ছে হয় না। মনে হয়, কত না শান্তি। মানুষের জীবনের মতো। এত বড়ো সমুদ্র, এত মুক্তি। তবু ফিরে ফিরে সেই ছোট্ট এক টুকরো দ্বীপ গড়ে নিতে ইচ্ছে হয়। সেই ছোট্ট এক টুকরো দ্বীপের মধ্যে বন্দী থাকতে ইচ্ছে হয়। শুধু মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে ওঠে, বুকের কাছে লুকিয়ে বাখা নকশাটা নিয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয় গুপ্তধনের সন্ধানে। মাটির নীচে কোথায় লুকনো আছে ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর। সেই মোহরের লোভে।

আল্‌ভাও তাই নকশার কথা বলতে বলতে পাগল হয়ে ওঠে। চোখ দুটো আশায় আনন্দে জলে ওঠে তার। বলে, যাবেন কর্তা, নিয়ে যাবেন আমারে ?

—কোথায় ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে সমীরণ।

সমীরণ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আল্‌ভার পিঠের ওপর দুটো নরম হাতের স্পর্শে চমকে উঠল সে।

আকাশী ফিসফিস করে বললে, তুফান আসছে গায়েন, ডিঙিটা জুয়ারে ভাসে যাবে।

ঝড় আসছে। সত্যিই সমস্ত আকাশ কালো হয়ে উঠেছে, দ্রুতবেগে ঝড় এগিয়ে আসছে। ঠাণ্ডা জলো বাতাসের স্পর্শে তন্ময়তা

ভাঙল সমীরণেরও।

বললে, চল আল্‌ভা, ডিঙিটা বেঁধে আসবে।

দ্রুতপায়ে তীরের দিকে হেঁটে চলল আল্‌ভা আর আকাশী। পিছনে পিছনে সমীরণ। পা টলছে তার, আলভা লক্ষ্য করল।

হঠাৎ একসময় ফিরে তাকিয়ে আল্‌ভা হাসল।—আপনি ন্যাশা করছেন কর্তা?

—হুঁ।

আবার চুপচাপ হেঁটে চলল তারা।

সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়াল সমীরণ।

সোঁ সোঁ করে ইতিমধ্যে ঝড় এসে গেছে। বালির ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। টলে টলে পড়ে আকাশী। বাতাসে উড়ে পড়ে তার ঘাগরা।

এদিকে ফুলে ফুঁসে উঠছে সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে উন্মত্ত আক্রোশে। ঢেউয়ের আগে বালির ঝাপটা পড়ছে তীব্র উন্মাদনায়। তীরের উপর সারি সারি ডিঙি পড়ে আছে। জেলেদের জাল টাঙানো আছে বাঁশের গায়ে। ঝড়ের দাপটে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায় জালগুলো।

আশ্চর্য, টিয়ারঙের জেলেরা সারাদিনের খাটুনির পর হয়তো অকাতরে ঘুমচ্ছে ক্লান্ত হয়ে। ডিঙি বাঁধবার জন্যে, জাল সরাবার জন্যে কেউ ছুটে আসেনি।

ছুটে এসেছে শুধু আল্‌ভা। ডিঙি কেটে গেলে, জোয়ারের ধাক্কায় ডিঙি ভেসে গেলে মাটিতে যাবে কি করে সে! তার সোনার মোহরের ঘড়া পাবে কি করে।

ডিঙিটা টেনে টেনে ওপরে তুলল আল্‌ভা আর আকাশী। শালের খুঁটিতে বাঁধল শক্ত করে। তারপর একে একে জালগুলো খুলে ঘুমুন্সিতে তুলে রাখল। ছোট ছোট ছাউনি, জেলেরা শীত বর্ষায় এই ঘুমুন্সির ঘরে এসে রাত কাটায়, ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে ডিঙি নিয়ে।

আল্‌ভা আর আকাশীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমীরণও জালগুলো টেনে তুলতে সাহায্য করল।

ক্রমশ বৃষ্টি নামল অঝোর ধারায়। আকাশ কাঁপিয়ে বাতাস কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে।

কাজ সেরে দ্রুতপায়ে বস্তির পথ ধরল আল্‌ভা আর আকাশী।

বললে, ঘরকে চলেন কর্তা, বর্ষা নামছে। দেরি হলে খালে জল নামবে, পার হতে পারবেন না।

এগারো

সেদিন ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছিল ফিরুজা। নেশা ছুটে গিয়েছিল তার। কিন্তু ফিরে এসে মদ্‌নাকে বলতে পারেনি কথাটা। বহুদিন ইচ্ছে হয়েছে, বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত চেপে গেছে। ভয় হয়েছে, কি জানি কথাটা শুনে না সন্দেহ হয় মদ্‌নার। না মনে করে ফিরুজা পাপ করেছে, ধর্ম হারিয়েছে সমীরণের কাছে। আবার আশঙ্কাও হয়েছে তার। নেশা করিয়ে বেচাল ফিরুজাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল সমীরণ, এ-কথা জানলে হয়তো ধারাল কোপাইটা নিয়েই বেরিয়ে পড়বে মদ্‌না। নতুন বাবুর মাথাটা কুপিয়ে নিয়ে এসে হয়তো ছুঁড়ে দেবে ফিরুজার পায়ের কাছে।

মেয়েদের যেমন খুনিয়া, পুরুষদের হাতে তেমনি কোপাই। কুড়ুলের মতো দেখতে, কিন্তু ক্ষুরের মতো ধার। বনের ভেতর দিয়ে আনাগোনা করতে হয় টিয়ারঙীদের, হঠাৎ একটা চিতা বাঘ লাফিয়ে পড়লে এই কোপাই কুড়ুলের এক কোপে শেষ করে দেওয়া যায়। তারপর এর ধারাল ফলা দিয়েই চামড়াটা ছাড়িয়ে কাঁধে ফেলে নির্ভয়ে নিজের নিজের কাজে চলে যায় পুরুষগুলো। আবার সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় যখন ডিঙি নিয়ে তখনো সঙ্গে থাকে। হাঙর কি খুনী মাছ ডিঙি তাড়া করলে লম্বা দড়িতে বেঁধে এই কোপাই ছুঁড়ে দেয় জেলেরা। হাঙরের পিঠে বসে যায় কুড়ুলটা, রক্তের ফিনকিতে লাল হয়ে ওঠে জল। আর যন্ত্রণায় ছুটে বেড়ায় হাঙরটা। বঁড়শির সুতোর মতো দড়ি ছাড়তে থাকে জেলেরা, যতটা সম্ভব। তারপর একসময় দড়ি ফুরিয়ে যায়, শেষ প্রান্তটা ডিঙিতে বেঁধে টাল সামলাতে হয়। আর খেপা হাঙরটার টানে বিদ্যুৎগতিতে এঁকে বেঁকে ছুটতে থাকে ডিঙিটা। শেষে

একসময় নির্জীব হয়ে পড়ে হাঙরটা, আর ধীরে ধীরে দড়ি গুটতে থাকে জেলেরা। পিঠ ভেসে উঠতেই আবার দু-তিনটে কোপাই ছুটে এসে গেঁথে যায় হাঙরের পিঠে।

চিতা মারতেও কোপাই, হাঙর মারতেও কোপাই। মানুষ তো সামান্য ব্যাপার। তাই বড়ো ভয় পায় ফিরুজা। আর এই ভয়েই গোপন কথাটা কোনোদিন বলেনি সে।

কিন্তু সাঙা হয়ে যাবার পর না বলে পারল না।

সেদিনও সারা রাত ধরে অবিরাম বৃষ্টি আর ঝড়। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে। আর খড়ো চালের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জল আর ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া।

চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিল ফিরুজা আর মদনা। পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুটি স্বাস্থ্যে ভরা শরীর। যৌবনের উদ্দামতা দুজনেরই চোখে। দেহে কামনার ছন্দ।

গভীর আশ্লেষের ঈষৎ তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি কথা।

এমনি নিবিড় আনন্দের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি যেন চকিতে ভেসে ওঠে ফিরুজার চোখের সামনে। এমনিভাবেই অন্তরঙ্গ স্পর্শের শিহরণ জাগত সেদিনও।

যমুনীর কথা মনে পড়তেই ভয়ে দুলে উঠল ফিরুজার বুক।

ঘুম-জড়ানো চোখে মদনা জিগ্যেস করল, কাঁপন লাগছে তর, ফিরুজা ?

মদনা ভাবলে বৃষ্টির ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটাতেই বুঝি কেঁপে উঠেছে ফিরুজা।

ফিরুজা প্রথমটা উত্তর দিল না। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ডর

লাগছে রে মাদোন, এমন সুখটা সয় কি না সয়।

হাসল মদ্‌না, তৃপ্তির হাসি। মুখটা তার ফিরুজার মুখের উপর ঘষল।

—সাঙার মানুষটা তরে সুখ দিছে?

—খু-উ-ব। মন কইছে, যৈবনটা পুরণ হল। কিন্তু বড়ো ডর লাগে রে······

—ক্যানে?

—ভাবন লাগছে কি যম্‌নী মানুষটো যদি আসে দেখে তার ফিরুজা সাঙা করছে······

মদ্‌না হেসে উঠল সশব্দে। বললে, ডর নাইরে ফিরুজা ডর নাই। যম্‌নী জেলেটা ফির‍্যা আসে তো ছাড়ে দিব তরে। তার বুকেই শুয়া থাকিস তুই।

—উহু। আপত্তি করে ফিরুজা। বলে, তরে ছাড়ে দিয়ে যম্‌নীর চাটাইয়ে ফিরতে নারব আমি।

—ক্যানে?

—তর ঘামটা পদ্ম লাগে রে, অর ঘামটা পঙ্ক লাগে। বলে খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা। স্বতঃস্ফূর্ত হাসিটা যেন বিদ্যুতের চমক দিল।

মদ্‌না হেসে বললে, তবে ডর করিস না, কোপাই দিয়ে যম্‌নীর মাথাটা ·····

শিউরে উঠে বসল ফিরুজা। হাতে মুখ চাপা দিল মদ্‌নার। বললে, না মাদোন, এই কামটা পাপ বটে। আমি যম্‌নীর বিবি বটি, বাঁচে থাকলেও বিবি, মরে যালেও বিবি। আমার যৈবনটা তর বটে মাদোন,

ধরমটা অর।

কথাটা ঠিক যেন বুঝল না মদ্‌না। ও শুধু আরো গাঢ় আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিল ফিরুজাকে।

ফিরুজা তার নরম শরীরটা মদ্‌নার সক্ষম দেহের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে সোহাগ-ভরা কণ্ঠে বললে, কোপাই দিয়া তুই মানুষ মারতে নারবি, কথা দে মাদোন।

—তর ইচ্ছাটাই কথা হল, এত ডরাস ক্যানে!

ফিরুজা হেসে বললে, তর কোপাইটারে বড়ো ডর লাগে, গোপন কথাগুলোও তাই কইতে ডর লাগে।

—কি কথাটা বটে? হাসল মদ্‌না।

ফিরুজা মৃদু হেসে চুপ করে রইল একটুক্ষণ। ভাবলে, বলবে কিনা কথাটা। এমন অনেকবার ভেবেছে ও। কিন্তু বলতে পারেনি।

তামসীকে দেখে মদ্‌না একদিন বলেছিল, ছুটদিদিটারে বড়ো সোন্দর দেখায় রে, টিয়ারঙের মেয়েগুলান ছুটদিদির পানা সোন্দর লয়।

সে-কথা শুনে আহত বোধ করেছিল ফিরুজা। সে জানে, তামসীর মতো রূপসী মেয়ে সত্যিই নেই টিয়ারঙাদের মধ্যে। তবু মদ্‌নার মুখে যেন শুনতে চায়নি কথাটা। তাহলে মদ্‌নার চোখে সেই সবচেয়ে সুন্দর নয়? নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছিল ফিরুজা, তামসীর বেশভূষাই তাকে সুন্দর করে তুলেছে। ছুটদিদির মতো দামী রঙিন কাপড় পরলে ফিরুজাকে আরো সুন্দর দেখাবে। তাই শাড়িটা চুরি করে এনে লুকিয়ে পরেছিল ফিরুজা। ইচ্ছে ছিল, এই পোশাকে তাকে দেখে মদ্‌না বল্‌বে, ফিরুজা ছুটদিদির চেয়েও সুন্দর।

কিন্তু, না, সেদিকে চোখ পড়েনি মদ্‌নার। ও শুধু চুরিটাই

দেখেছিল, ভেবেছিল টিয়ারঙীদের ইজ্জতের কথা।

শাড়ি ফেরত দিলেও আঘাতটা ভুলতে পারেনি ফিরুজা। কোনো-রকমে নিজের রূপকে ছুটদিদির চেয়ে সুন্দর প্রমাণ করার জন্যে খোঁপায় ফুল জড়িয়েছে, চেয়ে-আনা আতর মেখেছে, রোজের মজুরি বাঁচিয়ে জলে-ভাসা সাবান কিনেছে।

কিন্তু কিছুতেই এই একটা কথা শুনতে পায়নি সে মদনার কাছে, যে-কথাটা শুনলে শান্তি পেত, তৃপ্তি পেত।

তারপর নতুন বাবুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে সেদিনের সেই দৃশ্যটুকু মনে মনে ভাবতে ভাবতে খুশিতে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে সে।

নতুন বাবু তাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল। ভাঁড়ের পর ভাঁড় মদ খেতে দিয়েছিল তাকে।

ছুটদিদি যদি তার চেয়ে সুন্দর হত তাহলে কি টিয়ারঙের নোংরা মেয়ে ফিরুজাকে এমনভাবে কাছে টানতে চাইত নতুনবাবু!

সমীরণ যে তাকে মদনার মতো করেই কাছে পেতে চায় এটা যেন গর্বের কথা। মদনাকে সে-কথাটা বার বার জানাতে চেয়েছে ফিরুজা। ভেবেছে, এ-কথা শুনলে মদনা বুঝবে ছুটদিদির চেয়েও সে কত সুন্দর। শুধু বলতে পারেনি এই ভয়ে যে মদনা সন্দেহ করবে, সে সত্যিই বুঝি পাপ করেছে।

তবু শেষ পর্যন্ত না বলে পারল না।

বললে, তর কোপাইটারে বড়ো ডর লাগে, গোপন কথাগুলাও তাই কইতে ডর লাগে।

—কি কথাটা বটে? প্রশ্ন করলে মদনা।

ফিরুজা হেসে বললে, তর চখে ছুটদিদিটা সোন্দর বটে, কিন্তুক লতুন বাবুটা কয় ফিরুজা ছুটদিদির চেয়েও সোন্দর।

—মাটির লোক বটে লতুন বাবু, অরা মিছা কয়।

ফিরুজা ঈষৎ রাগের কণ্ঠে বললে, মিছা লয় রে মিছা লয়। লতুন বাবু আমারে সাঙা করবে কয়েছিল।

বাজের আওয়াজ শুনেও এমন করে চমকে ওঠে না মদ্না। কথাটা চাবুকের মতো তার পিঠে পড়ল যেন। চন্ করে রক্ত উঠে গেল মাথায়।

উঠে বসল মদ্না, একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখল ফিরুজার মুখের দিকে।

তা দেখে সশব্দে খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

বললে, মিছা কথাটা শুনে তড়াক করিস ক্যানে?

—মিছা বটে? একমুখ হেসে ফেলল মদ্না।

না, সত্যি নয় কথাটা। ছুটদিদির সঙ্গে নতুন বাবুর ভাবসাব দেখেছে মদ্না। ছুটদিদির মতো সুন্দর মেয়েকে ছেড়ে টিয়ারঙের জংলা রূপকে ভালবাসবে কেন সে!

তবু সাবধান করবার জন্যেই মদ্না বললে, বাবুরা মানুষ ভালো লয় রে ফিরুজা, মানুষ ভালো লয়।

মানুষ যে ভালো নয় তা ফিরুজাও জানে। তবু কেমন একটা মোহ আছে বাবুদের কথায় বার্তায়, কি এক আকর্ষণ। মনে হয়, বাবুরা অনেক সুখে আছে। তাদের মতো কষ্টের জীবন নয়। রাজামানুষ বাবুরা, কত টাকা তাদের। কত শাড়ি-গয়না। এক একসময় ফিরুজার মনে হয় সে যদি ছুটদিদির মতো হতে পারত, কিংবা তাপুদিদির

মতো! এমন নোংরা খড়পাতার ঘরে রোদেজলে কষ্ট পেতে হত না।

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ফিরুজা।

এদিকে সারারাত বৃষ্টি আর ঝড়। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়, কড় কড় করে বাজ পড়ে। ঘুমের ফাঁকেই চমকে চমকে ওঠে ফিরুজা।

কিন্তু সকাল বেলার জন্যে এমন একটা চমক অপেক্ষা করে আছে জানত না ফিরুজা।

চিৎকার হট্টগোলে ভোর বেলাতেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

আকাশী চিৎকার করে ডাকছে তাকে।—ফিরুজা, ফিরুজা।

ধড়মড় করে উঠেই বাইরে বেরিয়ে এল সে। দেখলে উত্তেজনায় আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপছে আকাশী।

—কি হয়েছে রে আকাশী, চেঁচাস ক্যানে?

কোনো উত্তর দিল না আকাশী। ফিরুজার হাতখানা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। বললে, জল্‌দি আয় ফিরুজা, জল্‌দি আয়।

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল ফিরুজা। কানে কানে কি যেন বললে আকাশী আর আকাশীর সঙ্গে একরকম ছুটতে ছুটতে চলল সমুদ্রের পাড়ের দিকে।

সারারাত বৃষ্টি হয়ে গেছে অবিরাম। নালাটা জলে থইথই করছে জোয়ার আসা নদীর মতো।

পাড় থেকে একটা ডিঙি খুলে নিয়ে ফিরুজা আর আকাশী স্রোতে ভাসিয়ে দিল। খাল পার হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল

বালির ওপর।

ঝড়ের চিহ্ন পড়ে আছে তীরের ওপর। ছোট ছোট ঘুমুঙ্গি-ঘরগুলো ভেঙে পড়েছে, চালার খড়-পাতা উড়ে গেছে এখানে সেখানে। ডিঙি-গুলো উলটে গেছে, ছিটকে পড়ে আছে দূরে।

কিন্তু……

দূর থেকেই দেখতে পেল ফিরুজা। একটা লোক বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে মড়ার মতো।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল ফিরুজার। মরে যায়নি তো লোকটা!

না, মরেনি। মুখটা তুলে ধরতেই সেটা ধপ করে পড়ে গেল আবার বালির ওপর।

আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠল ফিরুজা।

যমুনী। তার সেই হারিয়ে-যাওয়া স্বামী যমুনী জেলে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে।

আকাশী বললে, কাঁদিস ক্যানে, মানুষটারে বাঁচাতে হবে নাই?

নাকের কাছে হাত রেখে দেখল ফিরুজা, বুকের ওপর কান পাতল। না, বেঁচে আছে মানুষটা, বেঁচে আছে।

আকাশী ছুটে গেল জল আনতে। মুখে-চোখে ঝাপটা দিলে জ্ঞান ফিরবে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে শুধু, মরেনি।

ফিরুজা ভালো করে তার দিকে তাকাল এবার। নীল রঙের প্যাণ্ট, গায়ে একটা সবুজ কুর্তা।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দূরে একটা ডিঙি দেখতে পেল ফিরুজা। উলটে পড়ে আছে বালির ওপর। অচেনা ডিঙি।

কই, এ ডিঙি তো টিয়ারঙীদেব নয়

তবে কি এই ডিঙি কবেই আসছিল যমনা? সমুদ্রের তুফানেব মধ্যে পড়ে তীরে এসে ভিড়েছে?

নালাব জল নিয়ে ফিবে এল আকাশী। চোখে-মুখে ঝাপটা দিতেই কয়েক মুহূর্ত পবে জ্ঞান হল যমনাব। একটু একটু করে চোখেব পাতা খুলল।

অস্ফুটে বললে, নাচ্‌নী!

আকাশী আর ফিকজা পবস্পবের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

নাচ্‌নী কে?

বারো

একে একে সবাই ভিড় করে এল ফিরুজার হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার চারপাশে। যম্‌নী জেলে ফিরে এসেছে, এত বছর বাদে ফিরে এসেছে লোকটা। এত বড়ো খবর অনেকদিন শোনেনি টিয়ারঙীরা।

কিন্তু লোকটার হাবভাব, কথাবার্তা, পোশাকপরিচ্ছদ সবই যেন বদলে গেছে।

কোথায় ছিল সে এতদিন?

যম্‌নী হাসে প্রশ্ন শুনে, আর তার বিচিত্র ভাষায় বলে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী।

ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল বটে যম্‌নী জেলে, তারপর পথ ভুল করে চলে গিয়েছিল মাটিতে। সেখান থেকে গঞ্জে। তারপর এক নাচের দলে নাম লিখিয়েছিল।

যম্‌নীর বুড়ো বাপ ফোক্‌লা দাঁতের হাসি হেসে বলে, জেলের বেটা তুই, নাম লিখালি লাচের দলে?

যম্‌নী হাসে। বলে, খুবসুরত একটা নাচ্‌নী ছিল দলে, ও লেড়কিটা বললে নাম লিখাতে তো নাম লিখালাম।

টিয়ারঙীরা হাসে সে-কথা শুনে। বুড়ো বাপটাও তার হাসে।

এরই ফাঁকে বুধা এসে দাঁড়াল কাছে।

বুড়ো বললে, মরদ হয়েছে তর বেটাটা, দেখরে যম্‌নী।

যম্‌নী বুঝতে না পেরে এপাশ-ওপাশ তাকালে।

টিয়ারঙীরা হেসে উঠল হো হো করে। অর্থাৎ বুধাকে চিনতে পারছে না তার বাপ। কি করে চিনবে। বেশ বড়োসড়ো হয়েছে যে ছেলেটা। যম্‌নী চলে যাওয়ার পর কত বছর পার হয়ে গেছে।

কে হিসেব রেখেছে।

বুড়ো টেনে এনে সামনে দাঁড় করাল বুধাকে।

এই এতবড় হয়েছে তার ছেলে? চমকে উঠল যম্‌নী।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, ফিরুজা কাঁহা গেল! বাচ্চার মা।

তাই তো, গেল কোথায় ফিরুজা? আকাশীর সঙ্গে সেই তো পাড় থেকে তুলে এনেছিল যম্‌নীকে। তারপর গেল কোথায়?

সবাই এদিক ওদিক দেখল। না, আসেনি ফিরুজা।

শুধু আকাশী বললে, উ ঘরকে গেছে।

বুড়ো হাসল নিজের মনেই। তারপর ছেলেকে বললে, উ ফিরুজার পানে লজর দিয়ে কাম নাই তর। মদ্‌নার সাথে সাঙা হয়েছে ফিরুজার।

—হাঁ? সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে সশব্দে হেসে উঠল যম্‌নী।—হামি শালা নাচ্‌নীর দলে চলে গেলাম তো উ শালীভি নাচ লাগাল।

যেন কত বড় রসের কথা, এমনভাবে হেসে উঠল যম্‌নী। সবাই বিস্মিত হল। এতবড় একটা ঘটনাকে এত সহজ ভাবে নেবে সে, কেউ ভাবতেও পারেনি।

কে বলে উঠল, তা যম্‌নী ভাই, লাচেব দলে ছলে তো একটা লাচ দেখাও ক্যানে

—হাঁ, হাঁ, জরুর দিখাবো। বলেই উঠে দাঁড়াল যম্‌নী।

টিয়ারঙীরা হইহই করে উঠল। আল্‌ভার ডাক পড়ল।

—আল্‌ভারে ডাক, আল্‌ভা। বলল সবাই।

লজ্জিত মুখে রাবা হাতে এগিয়ে এল আল্‌ভা। একপাশে দাঁড়িয়ে রাবার তারে টুংটাং ধ্বনি তুলল। মিষ্টি মধুর জলতরঙ্গের সুর যেন।

নাচতে শুরু করল যম্‌নী। দু-পাক ঘূর্ণি দিয়েই থমকে দাঁড়াল। বললে, জুড়ি কাঁহা? জুড়ি নাই তো নাচ নাই।

বলেই ভিড়ের মধ্যে জোয়ান মেয়েগুলোর দিকে তাকালে।

আকাশীও দাঁড়িয়ে নাচ দেখছিল হাসতে হাসতে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ তাকে হাত ধরে এক ঝটকায় টেনে নিল যম্‌নী। তারপর উদ্দাম বেগে নাচতে শুরু করল। তালে তালে পা ফেলে যম্‌নীর জুড়ি হবার চেষ্টা করল আকাশী।

দেখতে দেখতে ওস্তাদ নাচনীর মতো নাচতে শুরু করে দিল আকাশী। নেশা জেগে উঠল যেন তারও।

উদ্দাম হয়ে উঠল টিয়ারঙীর দল।

অনেকক্ষণ পরে নাচ থামল। সাবাস দিল আল্‌ভা। মদের ভাড় এনে হাজির করল টিয়ারঙীরা।

আর দূরে দাঁড়িয়ে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল ফিরুজা।

লজ্জায় কাছে এগিয়ে আসতে পারেনি সে। ভয় পেয়েছে।

মদ্‌নাকে সাঙা করেছে সে এ-খবর শুনে রাগে জ্বলে উঠবে যম্‌নী, মনে হয়েছিল তার। ভেবেছিল, হয়তো রেগে গিয়ে কোপাই নিয়ে ধাওয়া করে আসবে তাকে।

মনে মনে অনেক কিছু ঠিক করে রেখেছিল ফিরুজা। কি বোঝাবে যম্‌নীকে। কি করে ঠাণ্ডা করবে।

প্রয়োজন হলে মদ্‌নাকে ছেড়ে দিয়ে আবার যম্‌নীর সঙ্গেই ঘর করবে ভেবেছিল। যম্‌নীর বুড়ো বাপ আর তার বুধাকে নিয়ে এসে সংসার বাঁধবে নতুন করে।

কিন্তু যম্‌নী এমনভাবে ঘা দেবে তার বুকে ভাবেনি ফিরুজা।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সে। দেখল, ফিরুজার কোনো খোঁজই করল না। একটা বাচ্চা মেয়ে এক ফাঁকে এসে খবর দিয়ে গেল ফিরুজাকে। বললে, তার সাঙার খবর শুনে নাকি হো হো করে হেসেছে যম্নী।

তবু হয়তো সহ্য করত ফিরুজা। বছরের পর বছর তার হারিয়ে-যাওয়া স্বামীর অপেক্ষা করেছে কি এইজন্যেই। দিনের পর দিন সাঙার অনুরোধ জানিয়েছে মদ্না, আর যম্নী আবার ফিরে আসবে ভেবেই না মদ্নার কথায় রাজী হয়নি সে। হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার কথা ভেবেই তো আধেক যৈবন কেটে গেছে তার।

অথচ সে-মানুষটা তার কথা একেবারেই ভুলে গেছে।

হঠাৎ আকাশীর হাত ধরে এক ঝটকায় তাকে কাছে টেনে নিয়ে যখন নাচতে শুরু করল যমনী, তখন তার চোখের মধ্যে কি যেন দেখতে পেল ফিরুজা। দেখল, আকাশীর চোখেও রঙ লেগেছে।

রাগে দুঃখে অপমানে সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠল। এই লোকটার কথা ভেবেই কিনা সাঙার দিনটা পিছিয়ে পিছিয়ে দিয়েছে ফিরুজা।

হঠাৎ মনের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। তার চোখে রঙ লাগিয়েছে মদ্না। নতুন সংসার পেতেছে সে, অনেক স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু যম্নীকে তো একেবারে ভুলে যায়নি। ফিরুজার মনের কোণে কোথায় একটু দুর্বলতা যেন লুকিয়ে ছিল। ভাবতে ভালো লাগত যে স্বামী তার বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে এখনো তার কথাই মনে পুষে রেখেছে। তাই আকাশীর কোমর জড়িয়ে ধরে উদ্দাম বেগে যম্নীকে নাচতে দেখে মনে মনে জ্বলে উঠল ফিরুজা।

মদ্না অবশ্য দেখেশুনে খুশিই হল। প্রথম কয়েকটা দিন একটু

ভয়ে ভয়ে, অস্বস্তির মধ্যে কাটাল।

শেষে বললে, মিছা ডর করিস রে ফিরুজা, উ যম্‌নী মানুষটা সব ভুলে গেছে।

কথাটা সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল মদ্‌না। কিন্তু চিমটির মতো লাগল ফিরুজার।

বললে, আকাশীর চোখে রঙ লাগছে রে, অখন আকাশীর রঙে মাতছে মানুষটা।

সত্যিই তাই। আকাশী যেন মেতে উঠেছে যম্‌নীকে দেখে, আর আকাশীকে দেখে মেতে উঠেছে যম্‌নী।

আল্‌ভা সেই আগের মতোই এখানে ওখানে বসে বাবা বাজায়, গান গায়। আর আকাশী ছুটে বেড়ায় সারা টিয়ারও। কোম্পানি মহল, কুলিদের বস্তি, বাবুদের বাংলো।

যম্‌নীকে আকাশী বলে, কোম্পানির কাজ লাও তুমি।

—কাজ লেগা? আরে দূর, নাচ দিখায়গা, বহুৎ পয়সা মিলবে নাচ দিখালে।

আকাশী হাসে হো হো করে।—পয়সা দিবে লাচ দেখে?

বিশ্বাস হয় না যেন তার।

যম্‌নী রেগে যায় তার অবিশ্বাস দেখে। রিঠের ঘুঙুর আর ঢোলক বানায়।

তারপর আকাশীকে ডাকে। বলে, চল্ নাচ দিখাবো বাবু-লোগদের।

আকাশীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় কোম্পানি মহলে। ঢোলক বাজাতে বাজাতে নাচ শুরু করে যম্‌নী। যম্‌নী আর আকাশী।

উদ্দাম যৌবনের ছন্দ নেচে ওঠে। ঘূর্ণির মতো উড়ে পড়ে আকাশীব রঙিন ঘাগরা। আর রিঠের ঘুঙরে শব্দ হয় ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম।

চিৎকার করে ওঠে কুলিমজুরের দল। বসিকতা করে, অশ্লীল রসিকতা। আর তা শুনে হাসে যম্‌নী, হাসে আকাশী।

ঝনঝন করে পয়সা পড়ে ওড়নার আঁচলটা পেতে দাঁড়াতেই।

ঘরে ফেবার পথে পয়সাগুলো গুনতে গুনতে মুগ্ধ হয়ে যায় আকাশী। নাচের দাম এত বেশি? সারাদিন খেটে যা না পায় এক ঘণ্টা নাচ দেখিয়ে তাব চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে আকাশী।

পয়সাগুলো তুলে নিয়ে হিসেব করে যম্‌না, তারপর আধাআধি করে ভাগ করে নেয় ত্বজনে।

ভাগেব পয়সাগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে আকাশী, আর খিলখিল করে হেসে ওঠে।

বলে, এতগুলান পয়সা, দেখে খুশি হবে গায়েন।

যম্‌নীর কানে যায় না সে-কথা। নিজের পয়সাগুলো কুর্তার পকেটে ভরে বলে, ভাটিতে চল্। দারু পিয়ে আসবো।

কোম্পানি মহলের মদের দোকানে মদ খেতে যাবে যম্‌নী।

হাত ধরে টানে সে আকাশীকে।

আকাশী হেসে হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে, ঘরকে চলো না, মদ আমার ঘরকে আছে।

—আরে দূর্। যম্‌নী হাসে। বলে, ত্বকানের দারু পিয়ে দেখো বহুৎ নেশা হয়।

শেষে আকাশীকে ছেড়ে দিয়েই মদের দোকানটার দিকে চলে যায়

যম্‌নী। আর আকাশী খুশি মনে পয়সাগুলো বার বার গুনতে গুনতে ঘরের পথ ধরে।

এসে দেখে আল্‌ভা চুল্লীতে আগুন জ্বালবার চেষ্টা করছে। ধোঁয়ায় চোখ ভরতি জল তার।

তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রান্নার যোগাড় করবার জন্যে এগিয়ে যায় আকাশী। বলে, আজ নাচ দেখিয়ে কত পয়সা মিলেছে আল্‌ভা, বাবুরা দিয়েছে, মজুররা দিয়েছে

বলে পয়সাগুলো আল্‌ভার হাতে দেয়।

ধোঁয়ায় জ্বালা-করা জলে-ভরা দুটো চোখ দুর্বোধ্য বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে আকাশীর দিকে।

তারপর হঠাৎ রাগে জ্বলে ওঠে আল্‌ভার শরীর।

পয়সাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় আল্‌ভা।

বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশী।

আল্‌ভাও রাগে? আল্‌ভার শরীরেও রাগ আছে?

তেরো

সত্যিই বুঝি আকাশীকে ভালোবেসে ফেলেছে আল্‌ভা। টিয়ারঙের ঠাণ্ডা মেয়ে আকাশী, তার রূপের মোহেই কি পড়ে আছে লোকটা ?

একদিন ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছেছিল আল্‌ভা। গঞ্জে গিয়ে পৌঁছনোর বদলে টিয়ারঙের দ্বীপে এসে ঠেকেছিল তার ডিঙি। তারপর হাতে 'রাবা' নিয়ে তিনতারের মিঠে সুরে সুর মিলিয়ে টিয়ারঙীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মাটিতে ফিরে যেতে পারেনি। হয়তো আকাশীর শান্ত রূপের মোহময় আকর্ষণেই টিয়ারঙে থেকে গিয়েছিল সে।

হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখেছিল আল্‌ভা। আকাশীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল। হয়তো ঘরের টানেই বাঁধা পড়ত সে। কিন্তু এমন যে হবে কোনোদিন কল্পনাও করেনি আল্‌ভা। ভাবতে পারেনি ফিরুজার হারিয়ে-যাওয়া মানুষটা এমনভাবে হঠাৎ একদিন ফিরে আসবে। ফিরে এসে তার বুক থেকে আকাশীকে কেড়ে নেবে।

আকাশীকে সত্যিই বুঝি কেড়ে নিতে চলেছে যমুনা। দিনের পর দিন সহ্য করে যায় আল্‌ভা। বোবা দুঃখের দুটি চোখ মেলে সব দেখে সে, সব সহ্য করে।

প্রথম প্রথম বাধা দিতে চায়নি আল্‌ভা। আহা, অনেক দুঃখ মেয়েটার। আল্‌ভার চোখের সামনেই তো বাবুদের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে আকাশীর বাপ মাধো সর্দার। অসহায় মেয়েটা তখনো বাবুদের কাছে ছুটে যায়নি টাকার লোভে, পাপ করেনি। তার বদলে তার চেয়েও অসহায় এই আল্‌ভার কাছেই ফিরে এসেছিল। তাই চোখের সামনে সব কিছু দেখেও দেখে না আল্‌ভা। ভাবে,

হয়তো তার চোখের ভুল, তার মনের অবিশ্বাস।

প্রথম যেদিন যম্‌নীকে সবাই নাচ দেখাতে বলেছিল সেদিন ভিড়ের মধ্যে থেকে আকাশীকেঁ জুড়ি হবার জন্যে যখন টেনে নিয়েছিল যম্‌নী তখন খুশিই হয়েছিল আল্‌ভা। কিন্তু সেই প্রথম দিনেই যে আকাশীর ঠাণ্ডা রক্তে এমন উষ্ণ নেশা জাগিয়ে দিয়েছে যম্‌নী, তা সে ভাবতে পারেনি।

নির্বাক্ হুটি চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে আল্‌ভা। দেখেছে, যম্‌নীর সঙ্গে নাচবার সময় আকাশীর সারা মুখ যেন খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। যম্‌নীর ডাক এলে একটা মুহূর্তও যেন অপেক্ষা করতে পারে না, ছুটে যায় আকাশী। তবে কি আল্‌ভাকে ভুলে গেছে সে, তবে কি যম্‌নীর নাচের ঘূর্ণিতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায়!

কে জানে। হয়তো মনের ভুল। হয়তো চোখের বিভ্রম।

মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে আল্‌ভা; নাচের নেশা জেগেছে আকাশীর রক্তে, যম্‌নীর নেশা নয়।

সারা দিন নাচ দেখিয়ে যখন রাতের অন্ধকারে ফিরে আসে আকাশী তখন ভাতের থালাটা এগিয়ে দেয় আল্‌ভা। বলে, তুমার লেগে বসে আছি সেই সাঁঝবেলা থেকে।

—উ আমি খায়ে আস্‌ছি বাবুদের হুকানে। বলে থালাটা সরিয়ে দেয় আকাশী।

আল্‌ভার চোখের কোণ হুটো চিকচিক করে ওঠে কিনা খবর রাখে না সে। নিজের মনেই গল্প করতে শুরু করে। কোন বাবু কি বলেছে তার নাচ দেখে, নাচ দেখিয়ে কত পয়সা পেয়েছে সে। যম্‌নী নাকি বলেছে, গঞ্জে নিয়ে যাবে তাকে, নাচ দেখাবে সেখানকার হাটে-

বাজারে। অনেক পয়সা মিলবে।

শোনে আল্ভা। চেষ্টা করে মুখে হাসি টেনে আনে। এমন ভাব দেখায় যেন আকাশীর ফুর্তিতে তারও আনন্দ।

সেই একটা দিনই সে আকাশীর নাচের পয়সাগুলো রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তারপরই অনুতপ্ত হয়েছিল আল্ভা। ক্ষমা চেয়েছিল।

—আমার মনটা বিষায় ছিল রে আকাশী।

বলে হাসিহাসি মুখে তাকিয়েছিল সে আকাশীর দিকে। কিন্তু আকাশী হাসতে পারেনি। আল্ভার শরীরে রাগ দেখে বরং খুশিই হয়েছিল সে।

নাচের নেশা অবোধ্য নেশা, জানে আকাশী। আর জানে তার চেয়েও বড়ো নেশা পয়সার নেশা। এ-আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার ইচ্ছে হয় তার, সরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

যমনী যখন এসে হাজির হয়, তার বিচিত্র ভাষায় যখন ডাক দেয়, নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না আকাশী। ছুটে যায়।

কিন্তু আল্ভা কেন পথ আটকে দাঁড়ায় না। কেন বলে না, না যেতে দেব না তোকে। তা নয়, লোকটা শুধুই বসে বসে রাবা বাজায়, আর মোহরের গল্প করে।

ঘাগরা উড়িয়ে একটা পাক দিলেই ঝনঝন করে একরাশ পয়সা পড়ে আকাশীর আঁচলে। সে-পয়সায় যা খুশি কেনা যায়। ছুটদিদ্দির মতো শাড়ি, গয়না। আর তার চেয়েও বড়ো আকর্ষণ—মদ। পচাই নয়, বাবুবাংলোর ওপারে কোম্পানিমহলের দোকানে পাওয়া যায় এ-মদ। বড়ো জবর নেশা হয়।

শুধু কি মদের নেশা, না মানুষটারও !

মাঝে মাঝে সাবধান করে দিতে আসে ফিরুজা।

ইতিমধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ে এসেছে তার কোলে। মেয়েকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ায় সে। বলে, সোনার লেশায় পাগল হয়ো না গায়েন-ভাই, তুমার ঘরের সোনাটারে ঘরে আনো।

শুনে হাসে আল্‌ভা। সত্যিই বুঝি মোহরেব স্বপ্ন দেখতে দেখতে আসল মোহরটাই হাবাতে বসেছে সে। আকাশীকে হারাতে বসেছে।

কিন্তু যাব চোখ নতুন রঙ দেখেছে তাকে ফিবিয়ে আনবে সে কি করে।

তবু আকাশীকে খুশি করবাব জন্যে পথ খোঁজে আল্‌ভা। সাবা দুপুব যম্‌নীব সঙ্গে কোম্পানিমহলে, কুলিমজুবদেব বস্তিতে নাচ দেখিযে বেড়ায় আকাশী। আর সেই সময়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁত বোনে আল্‌ভা। বাঁশের ছোট্ট হাত-তাঁতে রঙবেবঙেব টানা আব পড়েনে রঙিন নকশা ফুটে ওঠে। নিজের হাতে কাপাসের চাবা লাগিয়েছে আল্‌ভা, একটু-একটু কবে বড়ো হয়েছে গাছগুলো। তাবপব নিজেব হাতে সুতো কেটেছে সে, বঙ কবেছে দক্ষ রংরেজেব মতো।

দিনে দিনে কাপড়ের গাযে বিচিত্র সব নকশা ফুটে ওঠে, লাল হলুদ রঙে ঝলমল করে ওঠে কাপড়টা। নিজের হাতে ঘাগরা বানিয়ে দেবে সে আকাশীকে। আকাশীব নাচের ঘাগরা। তা হলে, তা হলে হয়তো চমকে উঠবে আকাশী। হয়তো আনন্দে ঝলমল কবে উঠবে তার মুখ। তাঁত বুনতে বুনতে মৃদু স্বরে গুনগুন করে আল্‌ভা, আর এক একসময় গান থেমে যায়। কল্পনাব চোখে দেখতে শুরু করে সে, ঘাগরা পেয়ে আকাশীর ডাগর চোখ দুখানা বিস্ময়ে বড়ো বড়ো হয়ে

উঠেছে, খুশিতে নেচে উঠেছে মেয়েটা।

দিনে দিনে কাপড়টা বুনে শেষ করে ঘাগরা বানিয়ে সেদিন তাই অপেক্ষা করে ছিল আল্‌ভা। নাচ দেখাতে গেছে আকাশী। ফিরে এলেই ঘাগরাটা নিয়ে গিয়ে হাজির করবে সে, আর তা দেখে আকাশীর বিস্মিত দুটি চোখ করুণ হয়ে উঠবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে।

সে-কথা ভাবতে ভাবতে নিজের হাতে বোনা কাপড়টার দিকে নিজেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল আল্‌ভা। হঠাৎ শুকনো পাতার মর্মর শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই সশব্দ খিলখিল হাসি ভেসে এল।

হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়াল ফিরুজা।—কিসের পানে ঠায় লজর গো গায়েনভাই।

ফিরুজাকে দেখে আল্‌ভাও তৃপ্তির হাসি হাসল।—আমার আকাশী লেগে বুনছি গো টিয়ারানী, অর নাচের ঘাগরা বানায়ছি।

বিস্মিত চোখে আল্‌ভার মুখের দিকে তাকিয়ে চট্ করে সামনে এগিয়ে এল ফিরুজা। দু-হাতে ঘাগরাটা তুলে নিল সযত্নে, পায়রার পিঠে হাত বোলানোর মতো করে নরম হাতে সেটার স্পর্শ নিয়ে বললে, কি সোন্দর বুনছো গো গায়েনভাই, বড়ো সোন্দর বুনছো। তুমার হাতটা বড়ো মিঠা গায়েন, বাবা লিলে মিঠা গান বাজে, তাঁতের কাঠি লিলে মিঠা লকশা ফুটে।

আল্‌ভার মুখে খুশি উছলে উঠল।—তুমার পছন্দ হইছে টিয়ারানী।

—হবে নাই? ঘাগরাটি আমারে দাও ক্যানে গায়েনভাই, মাদোনের

চোখটা ঝলসায় দিবো।

আল্‌ভা হাসল।—দিবো গো টিয়ারানী, তুমার লেগেও বুনে দিবো একটা। ইটা আমার আকাশীর নামে বুনছি।

হঠাৎ চোখ ছলছল করে উঠল ফিরুজার। কিছু বলল না। শুধু ঘাগরাটা বার বার খুলে আর ভাঁজ করে দেখল।

তারপর একসময় উঠে চলে গেল।

বললে, বিটিরে রেখে আসছি মাদোনের কাছে। যাই গো গায়েন-ভাই।

বলে তরতর পায়ে চলে গেল ফিরুজা। কিন্তু মনের মধ্যে ঘাগরার লোভটা রয়েই গেল। সত্যি, বড়ো সুন্দর নকশা বুনেছে আল্‌ভা। বড়ো চমকদার রঙের নকশা।

আল্‌ভার মনটাও ফুর্তিতে ভরে গেল। ফিরুজা বলেছে, বড়ো সুন্দর ঘাগরা হয়েছে, বড়ো সুন্দর নকশা।

কল্পনার চোখে দেখে আল্‌ভা, যেন এই ঘাগরা পরে নাচছে আকাশী। ঘূর্ণির মতো ঘুরছে সে ঢোলক বাজাতে বাজাতে, পায়ে রিঠের ঘুঙুর বাজছে ঝুমঝুম ঝুমঝুম। আর উড়ন্ত ঘাগরা থেকে যেন নীল হলুদ লাল সবুজের রঙ ছিটিয়ে পড়ছে, আলো ছিটিয়ে পড়ছে।

কিন্তু অপেক্ষা করে করে, অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল আল্‌ভা। রাত ঘনিয়ে এল, এখনো ফিরছে না কেন আকাশী।

আকাশীর পথ চেয়ে বসে থাকতে থাকতে একসময় তন্দ্রার ঘোর এসেছিল। হঠাৎ ঢোলকের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার।

চাঁদনী রাতের মৃদু জ্যোৎস্নায় দেখলে যমনী আর আকাশী আসছে। তাদের কথা আর হাসি ভেসে এল, ভেসে এল আকাশীর হাতের

ঢোলকের মৃদু শব্দ।

উঠে বসল আল্‌ভা।

প্রশ্ন করলে, কে আকাশী !

খিলখিল করে একমুখ হেসে ছুটে এল আকাশী। কোমরের ছোট্ট থলি থেকে পয়সাগুলো হাতে ঢালল ঝনঝন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, বাবুরা আজ টাক্কা দিয়েছে, টাক্কা। এই ছাখো ক্যানে !

বলে হাতের পয়সাগুলো মেলে ধরল সে আল্‌ভার সামনে।

তারপরই ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। একটা কুপি জ্বালিয়ে নিয়ে এসে বললে, বাবুদের টাক্কা লিয়ে ই কাপড়টা কিনে আনছি, ছুটদিদির পানা রাঙা কাপড়।

বলতে বলতে কাপড় আর টাকার আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে আকাশী। বলে, ই কলের কাপড় বটে, তাতের বুনা লয়। অনেক দাম বটে কাপড়টা।

আল্‌ভার চোখের কোণ হুটো জ্বালা করে ওঠে। একবার যম্‌নীর মুখের দিকে তাকায় আল্‌ভা, একবার আকাশীর মুখের দিকে। হ্যাঁ, নেশা করে এসেছে হুজনেই। মদের গন্ধ ভুরভুর করছে হুজনের মুখেই।

যম্‌নী ধীরে ধীরে বললে, আকাশী হামার নাচনী বটে, অরে গঞ্জমে লে যাবো। নাচ দিখালে বহুত রুপেয়া মিলবে গঞ্জমে।

টলতে টলতে বলে যম্‌নী।

আকাশী খিলখিল করে হাসে।—হাঁ, যাবো আমি, গঞ্জে যাবো নিচ্চয়। টাক্কা দিবে গঞ্জের মানুষগুলো। ভালো কাপড় কিনবো, কলের কাপড়।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আল্‌ভার বুক নিঙড়ে। ধীরে ধীরে

মাচার ভেতর লুকিয়ে রাখা ঘাগরাটা এনে মেলে ধরে সে আকাশীর সামনে।

বলে, তুমার লেগে বুনছি, নতুন নকশা দিয়ে বানায়ছি ঘাগরাটা। তুমার নাচের ঘাগরা।

খিলখিল করে হেসে ওঠে আকাশী। টলতে টলতে কুপির আলোতে ঘাগরাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

তারপর উপহাসের হাসি হেসে ওঠে। বলে, তাতের কাপড় পরবে লাচনী!

খিলখিল করে হেসে উঠে ঘাগরাটা সে তুলে ধরে যম্‌নীর সামনে।

বলে, গায়েনটা জংলী বটে, তাতের কাপড় বুনছে লাচনীর জন্যে।

বলেই সশব্দে হেসে ওঠে আবার।

তারপর একহাতে ঘাগরাটা, আর একহাতে কুপিটা নিয়ে আল্‌ভার দিকে যেতে যেতে বলে, ই ঘাগরাটা তুমার টিয়ারানীরে দিবে। তুমার টিয়ারানী। টেনে টেনে রসিকতার স্বরে বলে আকাশী।

বলতে বলতে হঠাৎ টলে পড়ে আকাশী, আর পরমুহূর্তেই হাত থেকে ঘাগরাটা পড়ে যায়। ঘাগরার ওপর জ্বলন্ত কুপিটা।

মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ঘাগরাটা।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধৈর্য ধরে যে-ঘাগরাটা বানিয়েছে আল্‌ভা, যে-ঘাগরাটা দিয়ে আকাশীকে খুশি করবে স্বপ্ন দেখেছে, মাতাল আকাশীর কুপির আগুনে সেটা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আল্‌ভার চোখের জলে সে-আগুন নেবানো যায় না। আল্‌ভার দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে সে-আগুন নেবে না।

চোদ্দ

যম্‌নীর বিরুদ্ধে ফিরুজার যত আক্রোশ তা ক্রমশ পরিণত হল আকাশীর বিরুদ্ধে।

প্রথম যেদিন সে সমুদ্রের পাড় থেকে যম্‌নীকে তুলে নিয়ে এল সেদিন হঠাৎ বুঝি পুরনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল তার। সেই কত বছর আগেকার হারানো দিনগুলো নতুন করে ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। সেই রঙিন স্মৃতিটুকু কতবার মনের পটে ছায়া ফেলে গেছে।

যম্‌নীর বাপ আর মা—বুড়ো-বুড়ী দুজনেই বেঁচে ছিল তখন। আর ছিল একরত্তি ছেলে বুধা। কোনো কোনোদিন যম্‌নীর সঙ্গে ডিঙিতে মাছ ধরতে যেত ফিরুজাও। মাছ ধরে ফিরে আসত অনেক রাতে। বুধা ঘুমিয়ে থাকত তখন বুড়া মায়ের কোলে। এসে আদর করে কোলে তুলে নিত তাকে যম্‌নী। আধ-ঘুম আধা-জাগা সোহাগে ছেলেকে ঘিরে কত সুখদুঃখের কথা হত। কত স্বপ্ন। কোনো কোনো-দিন বর্ষার রাতে খাল পার হত না। সমুদ্রের ধারে অন্ধকার ঘুমুঙ্গি ঘরেই রাত কাটাত যম্‌নী আর ফিরুজা। ঝমঝম ঝমঝম বৃষ্টি পড়ত সারা রাত, ঘুমুঙ্গি ঘরের চালে ঝড় লেগে শব্দ হত সনসন সনসন। ফিরুজা আর যম্‌নী পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ঘন হয়ে শুয়ে থাকত। অস্ফুটে দু-একটা কথা বলত যম্‌নী। বলত, বুধা বড়ো হলে তাকে গঞ্জে নিয়ে যাবে। মাছ ধরে আনবে যম্‌নী, আর গঞ্জমাঝি হবে বুধা। বুধা গিয়ে গঞ্জে বেচে আসবে সে-মাছ।

ফিরুজাও এক একদিন আবদার ধরত, সেও গঞ্জে যাবে।

হাসত যম্‌নী।—যাবো, যাবো। বুধার সাথে বুধার মাটারেও লিয়ে

যাবো।

খুশি হত ফিরুজা। মাটির কত গল্পই তো শুনেছে সে গঞ্জমাঝিদের কাছে। কল্পনার চোখে সে-সব যেন নতুন করে দেখতে পেত ফিরুজা।

তারপর একদিন টিয়ারঙীদের দলের সঙ্গে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছিল যম্‌নী।

রাত কেটে গেল, সকাল দুপুর হল, টিয়ারঙীদের ডিঙিগুলো সব একে একে ফিরে এল। ফিরে এল না শুধু যম্‌নীর ডিঙি।

আশায় আশায় বসে রইল ফিরুজা। কিন্তু না, ডিঙিটা আর ফিরল না।

টিয়ারঙের জেলের দল ডিঙি নিয়ে খুঁজতে বের হল, ঢেউয়ের পিঠে ভেসে ভেসে খুঁজে বেড়াল তারা। কিন্তু ফিরুজার হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার হদিস পেল না শেষ পর্যন্ত।

আর ফিরুজা দিনের পর দিন মানুষটার পথ চেয়ে বসে রইল। যম্‌নী হয়তো ফিরে আসবে, ফিরে আসবে যম্‌নী।

না, দিন মাস বছর পার হয়ে গেল। বছরের পর বছর কেটে গেল, ফিরে এল না যম্‌নী।

কি করবে ফিরুজা, কতদিন আর পথ চেয়ে থাকবে সে। বুড়া-বুড়ীর ঘরের ধান শেষ হয়ে গেল। দু-জোড়া পেটের ক্ষিদে সামলাবে সে কি করে। অপেক্ষা করে করে শেষে জুড়ি বাঁধল সে মদ্‌নার সঙ্গে। শক্ত সমর্থ জোয়ান চেহারা, বুকে নেই ভয়ডর। তার সঙ্গেই জুড়ি বেঁধে ক্ষেতে চাষ করতে, ধান বুনতে বের হল ফিরুজা। রোপাই শেষ হলে মদ্‌নার সঙ্গেই মাছ ধরতেও বের হত।

তারপর কি করে যেন মদ্‌নাকে ভালো লেগে গেল ফিরুজার।

তবু যম্‌নীকে ভুলতে পারল না সে। মনে হল একদিন না একদিন ফিরে আসবে যম্‌নী।

শেষ পর্যন্ত ফিরেই এল। কিন্তু সব স্বপ্ন ভেঙে দেবার জন্যেই যেন ফিরে এল। না, তার মন থেকে মুছে গেছে ফিরুজার ছায়া। ফিরুজাকে ভুলে গেছে সে।

তবু হয়তো সহ্য করতে পারত ফিরুজা। কিন্তু তারই চোখের সামনে কিনা আকাশীকে নিয়ে মেতে উঠল যম্‌নী। আর তার গায়েন-ভাইকে ছেড়ে, আল্‌ভার মতো মাটির মানুষকে ছেড়ে আকাশী কিনা ঢলে পড়ল নাচের নেশায়।

সবই দেখে, সবই দেখতে পায় ফিরুজা। আর সারা শরীর তার আক্রোশে জ্বলে ওঠে আকাশীর বিরুদ্ধে।

বলে, কথাটা শুন আকাশী, গঞ্জের কসবীগুলাব মতো লাচ দেখায় বেড়াস বাবুপাড়ায়, লাজশরম নাই তর?

শোনে আকাশী, শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

বলে, মদ্‌নারে তুই সাঙা করলি তো উ মানুষটার কি হবে? জুড়ি বাঁধবার সাধ নাই যম্‌নীর?

গম্ভীর হয়ে যায় ফিরুজা। চোখ ছলছল করে তার। যম্‌নীর মনের সাধটাই বড়ো হল আকাশীর কাছে? বউ ছেলে বাপ মা ভুলে যে-লোকটা গঞ্জের নাচনী মেয়ের সঙ্গে নাচ দেখিয়ে কাটাল এত বছর, টিয়ারঙের টানে একবারও মন কাঁদল না যার, তার জন্যে এত দরদ আকাশীর? কেন আল্‌ভা কি দোষ করল। গায়েনভাই তার দিনের পর দিন যে চোখের জল লুকিয়ে রাখছে তার কথাটা ভাবতে হবে না!

রসিকতার স্বরে আকাশী আবার বলে ওঠে, গায়েন মানুষটার তরে

দরদ ক্যানে তর ?

বলেই সশব্দে খিলখিল করে হেসে ওঠে আকাশী। বলে, উ পাগল বটে রে। মোহরের স্বপন দেখে গায়েন। আর যম্‌নীর সাথে গঞ্জে লাচ দিখালে ঝনক ঝনক মোহর ঝরে পড়বে পায়ের লীচে।

শোনে ফিরুজা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক নিঙড়ে। বোঝে, যে-নেশায় মেতেছে আকাশী সে-নেশা থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না তাকে।

আল্‌ভাকে এসে বলে, তুমি জুড়ি বাছে লাও গায়েনভাই, উ আকাশী আর ফিরবে নাই।

আল্‌ভা রাবা তুলে নেয় হাতে। মৃদু মৃদু গুনগুন স্বরে গান গাইতে শুরু করে।

তারপর একসময় রাবা থামিয়ে হাসে ফিরুজার দিকে তাকিয়ে।

বলে, নেশা ছেড়ে যাবে টিয়ারানী, নেশা ছেড়ে যাবে। টাকার নেশা লাগছে অর, নাচ দেখে বাবুরা টাকা দিছে সেই নেশা লাগছে। কিন্তু আল্‌ভা গরিব নয় টিয়ারানী, মোহর আছে আল্‌ভার, কলসভরা মোহর আছে। একবার মাটিতে বাবুরা নিযে গেলে······

বলতে বলতে কেমন যেন উদাস হয়ে যায় আল্‌ভার চোখ দুটো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে, আবার দূরের গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে ঢেউগুলো। আল্‌ভা যেন সেদিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে, তার ডিঙি ভেসে চলেছে মাটির দিকে, গঞ্জের দিকে। মাটিতে পৌঁছে তার সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে আনবে সে। ঘড়া ঘড়া মোহর। অনেক, অনেক টাকা।

তারপর নেশা ছুটে যাবে আকাশীর। আবার ফিরে আসবে আকাশী।

বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে আসে আল্ভার। লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফেরায় সে। আর ফিরুজার দু-চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

—তুমি মানুষ লও গায়েনভাই, তুমি মানুষ লও। বলতে বলতে ছুটে পালায় ফিরুজা। চোখের কান্না তার গলার স্বরে ভেঙে ভেঙে পড়ে।

কিন্তু পালিয়ে এসেও শান্তি পায় না সে। টিয়ারঙের নোনা বাতাসে সে'ও যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে এসে বসে যম্নীর বুড়ো বাপটার কাছে।

চিনতে পেরে হাসে বুড়ো।—ফিরুজা বটিস, মা বটে আমার ?

—হা।

চুপচাপ এসে বসে সে বুধার কাছে। গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। আদরে, স্নেহে।

বুড়ো বসে বসে দড়ি পাকায় আর অনর্গল কথা বলে যায়। নিজের দুঃখের কথা, ভবিষ্যতের ভাবনা। আর মাঝে মাঝে ধমক দেয় বুধাকে, পাক ভুল হচ্ছে তার।

পাক তো ভুল হবেই বুধার। ফিরুজা কাছে এসে দাঁড়ালেই কেমন সব ভুল হয়ে যায় তার। ভালোও লাগে। হঠাৎ সমস্ত মন তার ঝলমল করে ওঠে। মা তার গায়ে মাথায় যখন হাত বুলিয়ে দেয়, আদুরে স্বরে কথা বলে, তখন খুশিতে নেচে ওঠে বুধার চোখ দুটো। মনে হয় সারা দিন সে বসে থাকে মায়ের কাছটিতে।

কেমন যেন বোবা বোবা চোখ মেলে তাকায় বুধা। কি যেন

বলতে চায়, বলতে পারে না। কেমন রহস্যে ঘেরা যেন তার মায়ের মন। কোনো কোনোদিন বুধাকে ডেকে নিয়ে যায় ফিরুজা, আদর করে ছেলেকে কাছে বসিয়ে পেট ভরে খাওয়ায়। গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আবার হয়তো দিনের পর দিন কোনো খবরই নেয় না। চোখের দেখাটাও পায় না বুধা।

বুড়া বাপের কাছে শুনেছিল সে, বাপ তার হারিয়ে গেছে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে। শুনে কিছু না বুঝেই কাঁদত বুধা। আর ফিরুজা তখন সান্ত্বনা দিত। বলত, বাপ তর ফিরে আসবে রে, ফিরে আসবে।

শেষে ফিরেই এল যম্‌নী। বাপকে দেখবার জন্যে ছুটে গেল বুধা। টিয়ারঙীদের জমায়েতে ভয়ে ভয়ে বুড়া বাপের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে অবোধ্য দুটি চোখ চেয়ে দেখল সেই অদ্ভুত মানুষটাকে।

কিন্তু না, বুধাকে কাছে ডাকল না যম্‌নী, আদরে জড়িয়ে ধরল না। শুধু একবার তার দিকে তাকিয়েই হেসে উঠে যম্‌নী নাচতে শুরু করল।

লজ্জায় অপমানে সেদিন ছুটে পালিয়ে এসেছিল বুধা, পালিয়ে এসেছিল ফিরুজার কাছে। মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল সেদিন।

আজ আবার ফিরুজার হাতের স্নেহস্পর্শ পেয়ে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বুধা।

বুড়ো কাশতে কাশতে বললে, বুড়া হইছি, বুধা বেটার কি হবে রে ফিরুজা!

বুধাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফিরুজা বললে, বুড়াও আমার, বেটাও

আমার। অর বাপটা পাগল হইছে লাচের নেশায় তো ফিরুজা পাগল লয়।

বুড়ো এদিক-ওদিক তাকাল ভয়ে ভয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, যম্‌নী আসে বুধারে কাড়ে লিবে কয়ছে রে ফিরুজা। কয়, লাচ শিখাবে অরে।

—লাচ শিখাবে! খিলখিল করে সশব্দে হেসে ওঠে ফিরুজা। পাগলের মতো সশব্দে হেসে ওঠে সে।

তারপর ঝট্ করে খোঁপা থেকে খুনিয়াটা খুলে বুড়োকে দেখিয়ে বলে, ই খুনিয়াটাও লাচতে জানে। খুনিয়াটাও লাচে গো বুড়া।

পনরো

আবার জাহাজ এসে ভিড়ল টিয়ারঙের জাহাজঘাটায়। আর সেই প্রথমবারের মতোই হাসিমুখে নেমে এল তামসী।

সমীরণ দেখল, সৌমেন দেখল। দুজনের মনেই খুশির ফুল পাপড়ি মেলে দিল। কিন্তু এগিয়ে যেতে পারল না সৌমেন। সে শুধু দূর থেকে দেখল তামসীকে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল তার ছোট্ট ঘরটিতে।

তামসীকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সে। অনেক কামনা জেগেছিল তার মনে। কিন্তু সমীরণের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে লজ্জায় নুয়ে পড়েছে সে বার বার। মাসের পর মাস বেদনার্ত মনের কোণে শুধু অতীতের এক টুকরো মধুর স্মৃতি পুষে রেখে চলেছিল সে।

চাকরির চেষ্টায় এসেছিল সৌমেন। কিন্তু না, দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও কোনো চাকরি জোটেনি। এবার হয়তো ফিরে যেতে হবে তাকে। এভাবে নিজের জীবনকে নষ্ট হতে দেবে না।

তাই ইচ্ছে করেই যেন দূরে সরে যেতে চাইল সে তামসীর কাছ থেকে।

প্রথম প্রথম তামসীও যেন অস্বস্তি বোধ করে। এতদিন বাদে আবার নতুন করে সৌমেনের কাছে এগিয়ে যেতে সাহস পায় না।

অথচ সমীরণ কত সপ্রতিভ।

প্রথম যেদিন ফিরে এল তামসী, সমীরণ সহাস্যে এগিয়ে এসে বলেছিল, সে কি! কই, যা ভেবেছিলাম তা তো দেখছি না।

বলে তামসীর সিঁথিটার দিকে তাকিয়েছিল।

চমকে উঠেছিল তামসী, তারপর স্মিত হাসি হেসে প্রশ্ন করেছিল,

কি ভেবেছিলেন ?

—ভেবেছিলাম সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর দেখতে পাব। সপ্রতিভ স্বরে বলেছিল সমীরণ।

আর তা শুনে চ্যাটার্জি আর তাপসী দুজনেই সশব্দে হেসে উঠে তামসীকে লজ্জার মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল।

তামসীর বিয়ের কথাটা তার দিদির মনেও বার বার উঁকি দিয়ে গেছে। কোন ছোটবেলায় বাপকে হারিয়েছে তারা, বৃদ্ধা মা মৃত্যুর দিকে এক পা বাড়িয়ে ভিটে আঁকড়ে দিন গুনছেন। সুতরাং তামসীর বিয়ের ভাবনাটা তাপসীর কম নয়।

মাঝে মাঝে সমীরণের কথাটা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। ছেলেটিকে বেশ লাগে তাপসীর। কেমন চমৎকার মিশুকে, ছিমছাম চেহারা, ভালো চাকরি। এমন একটি পাত্র জুটিয়ে দিতে পারলে তবেই স্বস্তি পায় সে। স্বামীকে সে-কথা দু-একবার বলেছে তাপসী।

চ্যাটার্জিরও তাই মত।—তা মন্দ হয় না।

অনেক ভেবেচিন্তেই তামসীকে তাই আবার ফিরিয়ে এনেছে তাপসী। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে যেমন করে হোক এ-বিয়ে ঘটাতেই হবে। কিন্তু স্পষ্ট করে কথাটা সমীরণকে বলতে কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকে।

হয়তো এমন স্পষ্ট করে বলতে পারত না তাপসী। কিন্তু সুযোগটা যেন সমীরণই জুটিয়ে দিলে। সশব্দে হেসে উঠে সমীরণ বলল, ভেবেছিলাম সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর দেখতে পাব।

তাপসী ঠোঁট টিপে হেসে বললে, সেটুকু বোধহয় তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে সমীরণ।

কথাটা শুনেই সে গম্ভীর হয়ে গেল। পরমুহূর্তে হেসে উঠে বলল, তেমন ভাগ্য কি হবে এ-অভাগার।

বলে তাকাল সে তামসীর মুখের দিকে। তামসী ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে। খানিকটা অস্বস্তিতে, কিছুটা লজ্জায়। তারপর তরতর করে গ্যাংওয়ে পার হয়ে বাবুবাংলোর পথ ধরেছে। সত্যি, দিদিটা কি নির্লজ্জ। এমনভাবে এ-কথা বলা যায়? তাও সমীরণকে!

অভিমানে ক্রোধে ভালো করে কথাই বলেনি তামসী, বাসায় ফিরেও।

চ্যাটার্জি রসিকতা করে বলেছে, কি ব্যাপার, এতদিন পরে ফিরে এলে, মুখে হাসি নেই, কথা নেই······

রাগে চোখ ঠেলে জল এসেছে তামসীর। দিদির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়েছে তামসী।—কি বল তো তুই, কি ভাবলেন বল তো?······

তামসীর রাগ দেখে চ্যাটার্জি আর তাপসী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হেসে উঠেছে।

আর সেই সময়ে ফিরুজা কোলে মেয়ে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে।—গড় হই গো ছুটদিদি।

চোখের জল মুছে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে তামসী। ফিরুজা? হ্যাঁ, ফিরুজাই তো। আরো যেন সুন্দর হয়েছে টিয়ারঙের সেই মেয়েটা। মুখে তৃপ্তির ছাপ।

ফিরুজার কোলের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটার দিকে চোখ যায় তামসীর।

সহাস্থে এগিয়ে এসে মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয় সে। বলে, মেয়ে তোর ?

—হ্যাঁ গো ছুটদিদি, বাম্নু নাম দিছি। মাদোনের মেয়া বটে। সাঙাটা করলাম তো তুমি দেখলে নাই গো।

তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসল তামসী। তারপর ফিরুজাকে প্রশ্ন করলে, সাঙা করেছিস ?

—করি নাই ? মেয়া হল ক্যানে গো! বলে হেসে উঠল ফিরুজা।—আমার বিয়া হল বেটা হল, ফের সাঙা করলাম তো মেয়া হল। আর তুমার বিয়া হল নাই ছুটদিদি!

চ্যাটার্জি হেসে উঠে বললে, দেখলে তামসী! ওদেরও চোখে লাগছে।

—বেশ। আপনি চুপ করুন তো!

বলে কপট রাগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তামসী। কিন্তু মন থেকে মধুর সুরের গুনগুননিটুকু দূর করতে পারে না। সত্যি, জীবনের একাকিত্বে সঙ্গী পাবার রোমাঞ্চময় স্বপ্ন বার বার উঁকি দিয়ে গেছে। কত বিনিদ্র রাত্রিতে টিয়ারঙের সেই দু-দণ্ডের স্মৃতিটুকু অদ্ভুত আনন্দে কতবার নাড়াচাড়া করেছে তামসী। না, সমীরণ নয়। সৌমেনকে ঘিরে স্বপ্ন জেগেছে, স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে বার বার।

সমীরণকে ভুলে গিয়েছিল তামসী। মুছে গিয়েছিল তার স্মৃতি। কিন্তু সৌমেন বার বার উঁকি দিয়েছে তার কল্পনার জানলায়। অথচ টিয়ারঙে ফিরে এসে মনে হল সেই সৌমেনই যেন কত দূরে সরে গেছে। আর আগের মতোই পথ আগলে দাঁড়িয়েছে সমীরণ—যাকে ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই যেন উপেক্ষা করা যায় না।

আগের মতোই সৌমেনের কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হল তামসীর।

দুটো দিন অপেক্ষা করে করে কেটে গেল। তারপর নিজেই এসে হাজির হল সে সৌমেনের ছোট্ট ঘরটিতে।

চমকে উঠে দাঁড়াল সৌমেন ওর পায়ের শব্দে।

বিষণ্ণ হাসি হেসে তামসী প্রশ্ন করলে, ভালো আছ ?

মাথা নাড়ল সৌমেন, কোনো কথা বলতে পারল না।

আবার হাসল তামসী।—ভুলে গেছ ?

—কি হবে মনে রেখে ? দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল তামসী।

লজ্জা পেল তামসী, কেমন একটা অস্বস্তি। বুঝল, খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে সারা টিয়ারঙে।

সেদিনের হালকা রসিকতাটা নিরর্থক নয় জানিয়ে দিয়েছে সমীরণ। এই নিঃসঙ্গ দ্বীপের দুঃসহ জীবনে তামসীকে সঙ্গী বেছে নিতে রাজী হয়েছে সে। আর সে-খবর শুনে খুশি হয়েছে চ্যাটার্জি। খুশি হয়েছে তাপসী।

শুধু খুশি হতে পারেনি তামসী নিজে। কেন সমীরণের মতোই প্রগল্‌ভ আবেদনে এগিয়ে যেতে পারে না সৌমেন। কেন এই ভীরু অস্বস্তি তার!

জানলার পাশে গিয়ে বসল তামসী। অনিমেষ তাকিয়ে রইল সে সৌমেনের মুখের দিকে, যেন কিছু শুনতে চায়, যেন কিছু বলতে চায়। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এই মধুময় মুহূর্তটিতে।

ধীরে ধীরে সূর্যাস্তের লাল আলো নীল হয়ে আসে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে। ম্লান মেঘের মতো স্তব্ধ উত্তেজনায় অপেক্ষা করে তামসী।

অসহ্য নীরবতা ভেঙে সৌমেন বলে ওঠে, ফিরে যাও তামসী, রাত হয়ে এল।

হাসে তামসী। অদ্ভুত বিচিত্র সে-হাসির শব্দ। বলে, হ্যাঁ, যেতে হবে। তবু……

হঠাৎ ছুটে এসে সৌমেনের হাতটা জড়িয়ে ধরে তামসী। দু-চোখ জলে ভরে যায়। উচ্ছ্বাসের স্বরে বলে, এতদিন বাদে, কিছু বলবে না, বলবে না কিছু ?

তামসীর মুঠো থেকে হাতটা মুক্ত করে সৌমেন।

অমিয়বাবু আর রাণুদির কথা ভেসে আসছে, শুনতে পায় তামসী। বেড়িয়ে ফিরে আসছে।

দূরে সরে আসে তামসী।

আর সৌমেন মৃদু হেসে বলে, সব শুনেছি তামসী। তুমি সুখী হও।

—না, না, না। কি শুনেছ তুমি ? চিৎকার করে ওঠে তামসী। বলে, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। তুমি বল, তুমিও সুখী হতে চাও।

হাসে সৌমেন, দুঃখের হাসি।—তা হয় না তামসী। চাকরির চেষ্টায় এসেছিলাম, এবার ফিরে যেতে হবে।

আবার কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায় তামসী।

রাণুদি এসে ঢুকেছে।

চোখোচোখি হতেই একমুখ হেসে এগিয়ে গেল তামসী।

তারপর সারা সন্ধ্যাটা রাণুদির সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে গেল সে বিচলিত মন নিয়ে।

না, এভাবে নিজের জীবনকে নষ্ট করতে পারবে না তামসী। তার

গোপন বুকের রঙিন কথাগুলো মেলে ধরতে হবে তাপসীর সামনে।

সমস্ত রাত নিঘুম কেটে গেল। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি আর চোখের নীচে অবসাদের চিহ্ন নিয়ে এসে দাঁড়াল সে তাপসীর সামনে।

ফিরুজাকে তাপসী বলছে, তোদের নতুনবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে ছুটদিদির। শুনল তামসী।

আগের রাত্রেও চ্যাটার্জি আর তাপসীর নানান জল্পনা-কল্পনা শুনেছে তামসী। শুনে বিষিয়ে উঠেছে তার সারা শরীর।

ভোর বেলায় উঠে এসেও সেই একই কথা শুনল। বিরক্তিতে মন ভরে গেল তার।

আর তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল তাপসী। এ কি শরীর হয়েছে তামসীর ?

তামসী কঠিন চোখে তাকাল তাপসীর দিকে।—দিদি !

চোখে বিস্ময় ফুটল তাপসীর। ডাকটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল।

তামসী আবার ডাকল।—দিদি !

তারপর ছুটে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সে। কাঁদল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ।

কাছে এসে বসল তাপসী।—কি হয়েছে ?

কি হয়েছে ? কি হতে বাকী আছে ?

একে একে সব খুলে বলল সে।

শুনল তাপসী। দেখল, তামসীর দু-চোখে টলমল করছে দু-বিন্দু অশ্রু।

তামসীর পিঠের উপর একখানা সান্ত্বনার হাত রেখে বসে রইল

তাপসী। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে এল কপালে দুশ্চিন্তার রেখা নিয়ে।

দেখলে, বাইরের বাগানে স্বামী তার বন্দুকের নল পরিষ্কার করছে। পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল তাপসী।

স্বামী মুখ তুলে তাকাল।—বলছ কিছু ?

—হ্যাঁ।

—বল।

তাপসী হাসল।—এ-বিয়ে হবে না।

—কেন ?

—তামসীর ইচ্ছে নেই এ-বিয়েতে।

স্বামীর মুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখতে পেল তাপসী। যেন, এ-অদ্ভুত কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

তাপসী ধীরে ধীরে বললে, সৌমেনকে, অমিয়বাবুর .....

কথা শেষ হবার আগেই সব স্পষ্ট হয়ে উঠল চ্যাটার্জির কাছে। পরমুহূর্তেই অট্টহাসে হেসে উঠল। যেন কত বড়ো একটা হাসির কথা।

হাসির কথাই তো! একটা বেকার ছেলে, বসে আছে চাকরির চেষ্টায়, তার সঙ্গে তামসীর বিয়ে ?

সশব্দে হেসে উঠল চ্যাটার্জি। তারপর বন্দুকটা তুলে রেখে হনহন করে অমিয়বাবুর বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।

ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন অমিয়বাবু।—কি খবর মিঃ চ্যাটার্জি!

—সুখবর আছে।

দুটো চেয়ার পেতে বাগানেই বসলেন অমিয়বাবু আর চ্যাটার্জি

—আপনার সৌমেনের জন্যে চাকরির কথা বলেছিলেন না?

—হ্যাঁ, করতে পারলেন কিছু? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন অমিয়বাবু।

—হ্যাঁ, আপাতত একটা ক্লারিকাল পোস্ট। এই জাহাজেই পাঠিয়ে দিন, চিঠি দিয়ে দিচ্ছি স্টিফেন্স সাহেবকে।

একটু থেমে, এখানে নয়, কোম্পানির মাতলা আপিসে।

ষোল

চাকরি পেয়ে কোম্পানির মাতলা অফিসে চলে গেছে সৌমেন, শুনল তামসী। শুনে নিজের মনেই হাসল সে। আশ্চর্য, এমন ভীরু কাপুরুষ একটা মানুষকে ভালোবেসেছিল তামসী? এত স্বার্থপর? যাবার আগে কি একটা কথাও বলে যেতে পারত না সৌমেন, বলতে পারত না এমন কিছু, যা শুনে, সব হারিয়েও অতীতের মধুর স্মৃতিটুকুকে সম্বল করে রাখতে পারত তামসী?

গভীর অবসাদের ভার নিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা ঘুমুঙ্গি ঘরের নির্জনতায় এসে বসে তামসী। একাকিত্বের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। তাকিয়ে থাকে সফেন নীল সমুদ্রের দিকে।

যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। শান্ত নীল সমুদ্র থেকে একটি একটি করে উত্তাল তরঙ্গ ভেসে আসে, উদ্দাম আবেগে ফেটে পড়ে ঢেউয়ের সারি। স্মৃতির সমুদ্র থেকে একটি একটি করে বেদনার ঢেউ যেন তামসীর মনের তীরে এসে ভেঙে পড়ছে।

অনেক দূর থেকে একটা গানের কলি ভেসে এল। ক্রমে ক্রমে কাছে এগিয়ে এল সে-গান। তারপর তামসীর পাশ দিয়েই গান গাইতে গাইতে চলে গেল আপন-ভোলা আল্‌ভা। দূরের এক সারি গাছের আড়ালে মিশে গেল।

অনিমেষ চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল তামসী। সময়-হারানো দ্বীপের দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে।

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে তন্ময়তা ভেঙে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখল ফিরুজা এসে দাঁড়িয়েছে।

কোলের ফুটফুটে মেয়েটাকে বুকে চেপে সামনে এসে দাঁড়াল

ফিরুজা।

হেসে উঠে বললে, কি গো ছুটদিদি, নতুনবাবুর লেগে বস্তে আছো নাকিন গো ?

মৃদু হাসি দিয়ে বিরক্তি চাপা দিল তামসী। তবু বুঝতে পারল ফিরুজা। দপ্ করে হাসি নিবে গেল তার মুখ থেকে।

মুহূর্ত কয়েক তামসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে সমুদ্রের দিকে পা বাড়াল সে।

—শোন্! ডাক দিল তামসী।

ফিরে দাঁড়াল ফিরুজা। বললে, মাদোনটার লেগে এলাম গো ছুটদিদি। ডিঙি লিয়ে যেছে মাছ ধরতে, সাঁঝ হয়ে এল, ফিরে না ক্যানে।

ফেরে না কেন! বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরুজার মুখের দিকে তাকায় তামসী। কি যেন খুঁজে পেতে চায়।

আশ্চর্য! একদিন এই ফিরুজাকেই সমুদ্রের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল সে। তার সেই হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার আশায় আশায়। যতদূর চোখ যায়, অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত ফিরুজা, খুঁজত কোথাও ছোট্ট একটি কালো বিন্দু ঢেউয়ের পিঠে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসে কিনা। বহু বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ডিঙিতে করে আবার বুঝি ফিরে আসবে যম্নী, আশায় আশায় তাকিয়ে থাকত ফিরুজা। আজ আবার তেমনি দুশ্চিন্তা আর আগ্রহ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ফিরুজা।

ডিঙিতে করে মাছ ধরতে গেছে মদ্না। তার ছোট্ট মেয়ের বাপ গেছে সমুদ্রে ডিঙি ভাসিয়ে।

কিন্তু ফিরে আসে না কেন সে! উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে বার বার সমুদ্রের দিকে তাকায় ফিরুজা। বড়ো ভয় তার সমুদ্রকে।

ধীরে ধীরে বিকেলের আলো ম্লান হয়। সন্ধ্যা নেমে আসে। ওদিকে পুবের আকাশে মেঘ জমা হয়।

ঝড় আসছে, ঝড় আসবে।

উঠে দাঁড়ায় তামসী। ধীরে ধীরে বাংলোর পথ ধরে। আর ফিরুজা তরতর করে বালি মাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়ায় একেবারে তীরের জল ছুঁয়ে।

ছোট্ট মেয়েকে বুকে আঁকড়ে অনুসন্ধানী এক জোড়া চোখ সারা সমুদ্রের বুকে একটা ছোট্ট ডিঙিকে খুঁজে বেড়ায়।

অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট ডিঙিটা দেখা দেয়। খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে ফিরুজা। হাত নেড়ে ইশারা করে।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মদ্‌নার ডিঙি। ঢেউয়ের পিঠে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পৌঁছয় মদ্‌না।

পিঠে ভারী জালটা বয়ে নিয়ে আসছে মদ্‌না, কুঁজো হয়ে গেছে জালের ভারে।

সার্চলাইটটা ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিমের দিকে হেলে পড়তেই কালো জালের ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী মাছগুলো চিকচিক করে উঠল। স্পষ্ট হয়ে উঠল মদ্‌নার মুখখানা। সারা মুখে ঘাম চকচক করছে তার।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জলের দিকে ছুটে গেল ফিরুজা।

দু-একটা ফুর্তির কথা, দু-একটা টুকরো হাসি।

ঘুমুঙ্গি ঘরের খুঁটিতে জালটা টাঙিয়ে মাছগুলো ঝেড়ে নিল মদ্‌না। তারপর টোকায় ভরে নিয়ে বস্তির পথ ধরল।

এদিকে ঝড় এগিয়ে আসছে ক্রমশ। টিয়ারঙের ঝড়! সেই বিচিত্র উন্মাদ ঝড়ের সনসন আওয়াজ ভেসে আসছে।

দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে এল দুজনে।

শুনতে পেল রাবা বাজাতে বাজাতে কোথায় যেন গান গাইছে আল্‌ভা। করুণ একটা সুর ভেসে আসছে থেকে থেকে। গান নয়, কান্না যেন। আল্‌ভার গানে এমন বেদনার অশ্রু ঝরে পড়তে দেখেনি ফিরুজা।

নিজের মনেই বললে, গায়েনভাইটার গান লয় রে, চক্ষুর জল বটে গানটা।

মদ্‌নার বুকের মধ্যেও যেন সে-বেদনার স্পর্শ এসে লাগছে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মদ্‌নাও সায় দিল। বললে, আকাশী অর বুকে খুনিয়া বসায় দিছে রে।

সত্যিই বুঝি তাই। শান্ত ক্লান্ত আল্‌ভার দুটি চোখ যে-স্বপ্ন দেখেছিল তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে যম্‌নী।

ক্রমশ গানটা এগিয়ে আসছে কাছে। কান পেতে শুনলে ফিরুজা।

হ্যাঁ, ফিরুজার ঘরের দিকেই বোধহয় আসছে।

একটু পরেই শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ শুনতে পেল ফিরুজা। আর পরমুহূর্তেই দেখলে, রাবা হাতে গান গাইতে গাইতে এসে দাঁড়িয়েছে আল্‌ভা।

গান থামল তার। হাসি মুখে বললে, একটা কথা কইতে এলাম গো টিয়ারানী।

—কি কথা গো গায়েনভাই?

কি কথা? যে-কথাটা বলবার জন্যে দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা

সহ্য করেছে আল্‌ভা, সেই কথাটাই বলতে এসেছে যে। কিন্তু বলতে গিয়ে কি এক অস্বস্তি।

আল্‌ভা ধীরে ধীরে বললে, আকাশীরেই কইতাম টিয়ারানী, কিন্তু খুঁজে পেলাম না আকাশীরে।

বিস্মিত চোখ তুলে তাকাল ফিরুজা।—কুথায় আকাশী? খুঁজে মিললো না অরে?

—না, যম্‌নীর সাথে কুথায় লাচছে হবে!

বলে হাসবার চেষ্টা করল আল্‌ভা। সে-হাসিতে কেমন যেন অপ্রতিভ দেখাল তাকে।

খানিক চুপ করে থেকে আল্‌ভা বললে, টিয়ারানী, ডিঙি লিয়ে ফিরে চলল্যম আমি, তুমি কয়ে দিও আকাশীরে। কয়ো যম্‌নীরেই সাঙা করতে।

—ফিরা চললে? কুথায়? চমকে উঠল ফিরুজা।

হাসল আল্‌ভা। হাসি নয়, যেন কান্না। চোখ তুলে ফিরুজার দিকে তাকাতেও যেন কষ্ট হচ্ছে তার।

বললে, যেখান হইতে আসেছিলাম, সেই মাটিতেই ফিরে চললাম।

মদ্‌না এগিয়ে এল। জিগ্যেস করলে, গঞ্জের পানে? মোহর আনবার তরে?

আল্‌ভার মুখটা মুহূর্তে চুপসে গেল।

বললে, হাসো না মাদোনভাই। গঞ্জে গিয়া কি হবে, হাতের মোহরটাই হাতে রইল না। নকল মোহর লিয়ে কি হবে?

ফিরুজা এসে একটা হাত ধরল আল্‌ভার।

—না গায়েনভাই, ই টিয়ারও ছাড়ে কুথায় যাবে?

হাসল আল্‌ভা।—টিয়ারঙের টিয়াপাখিটা পালায় গেছে, রঙটা লিয়ে কি হবে রানী? আমি চললাম তুমাদের ছেড়ে, কয়ে দিও আকাশীরে।

বলে পা বাড়াল আল্‌ভা।

ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়াল ফিরুজা।—না গায়েনভাই, যাতে দিবো নাই তুমারে।

হাসল আল্‌ভা। আর পরমুহূর্তেই ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল তার দু-চোখ বেয়ে।

একদৃষ্টে ফিরুজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফিরুজাকে জড়িয়ে ধরল আল্‌ভা। কাঁদল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছোট ছেলের মতো।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল আল্‌ভা।

বললে, টিয়ারঙে মন থাকতে চায় গো টিয়ারানী শুধু ই বুনটির তরে। কিন্তু উ লাচনীর ঝুমুর শুনে প্রাণটা জ্বলে যায়।

বলে আবার পা বাড়ায় আল্‌ভা।—যাতে দাও টিয়ারানী, যাতে দাও।

ফিরুজার দু-চোখ বেয়েও তখন কান্না ঝরে পড়ছে। কি বলে আটকাবে সে আল্‌ভাকে, কি সান্ত্বনা দেবে? গায়েনভাই তার যা হারিয়েছে তা তো ফিরিয়ে আনতে পারবে না সে! কেন থাকবে আল্‌ভা, কিসের লোভ দেখিয়ে তাকে থাকতে বলবে ফিরুজা?

ধীরে ধীরে পা বাড়াল আল্‌ভা চলে যাবার জন্যে।

তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল সে। এগিয়ে এল ফিরুজার কাছে। বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা সেই ময়লা কাগজের টুকরোটা বের করে

বললে, ই নকশাটা আকাশীরেই দিও টিয়ারানী।

—নকশা ? চমকে উঠল ফিরুজা।

বিষণ্ণ হাসি হাসল আল্‌ভা।—হুঁ টিয়ারানী, আমার নকশাটা। গঞ্জের দিকে মাটিতে অনেক মোহর আছে আমার, সোনা আছে। আকাশীরে কয়ো উ সব সোনাদানা অরেই দিয়া গেলাম।

বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকায় ফিরুজা। তা হলে সোনার লোভে যাচ্ছে না আল্‌ভা ? তার লুকনো গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে নয় ?

না, আর কোনো কিছুতেই লোভ নেই আল্‌ভার। কোনো কিছুতেই না। শুধু রাবা হাতে নিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে চলে যাবে সে। যেদিকে চোখ যায়, কিংবা যেখান থেকে একদিন গুপ্তধনের লোভে এসেছিল সে সেই দিকেই।

ফিরুজা চোখ মুছে বললে, ঝড় আসে গায়েনভাই, ই ঝড়ের রাতে যায়ো না।

হাসল আল্‌ভা।—উ আকাশের ঝড়টা ভালো টিয়ারানী, আকাশের ঝড়ে বুকের ঝড়টা লিভে যাবে।

বলে ধীরে ধীরে চলে গেল আল্‌ভা। যেমন এসেছিল তেমনি রাবার তারে গুনগুন সুর তুলে চলে গেল তার গায়েনভাই। ক্রমশ গানের সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তে।

আর স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় যেন তন্ময়তা ভেঙে গেল ফিরুজার। চঞ্চল হয়ে উঠল সে।

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন এক প্রলয় ঘটে গেছে তার বুকের মধ্যে।

মদ্‌নার কোলে বাচ্চা মেয়েটাকে দিয়েই ছুটতে শুরু করল ফিরুজা।

ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে ডেকে উঠল, গায়েনভাই !

কোনো সাড়া এল না।

আবার চিৎকার করে ডাকল ফিরুজা।

—গায়েনভাই!

এবারও কোনো সাড়া এল না।

ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল ফিরুজা। তন্ন তন্ন করে খুঁজলে চতুর্দিক। না, আল্‌ভার ডিঙিটা নেই কাছে পিঠে। সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে তীরের ওপর। কালো অন্ধকার সমুদ্রের বুকে শাদা ফেনার সারি ফেটে পড়ছে।

যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে রইল ফিরুজা। তন্ন তন্ন করে খুঁজল। আর ডাকল চিৎকার করে।

—গায়েনভাই!

বার বার চিৎকার করে ডাকল ফিরুজা। সাড়া নয়, সে-ডাক বিচিত্র এক প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

ধীরে ধীরে জাহাজঘাটার সার্চলাইটটা ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম থেকে উত্তরে বাঁক নিতেই ফিরুজা চমকে উঠল।

ঢেউয়ের পিঠে ছোট্ট একটা কালো বিন্দু স্পষ্ট হয়ে উঠল সে-আলোয়। হ্যাঁ, আল্‌ভার ডিঙি ভেসে চলেছে ঢেউয়ের পিঠে দুলতে দুলতে।

ফিরুজা আবার চিৎকার করে ডাকলে, গায়েনভাই, ফিরা এসো, ফিরা এসো।

সে-ডাক পৌঁছল না আল্‌ভার কানে। আর সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিরুজার দু-চোখের কোণে দুটি অশ্রুবিন্দু টলমল করে উঠল।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ যেন কোনো সংবিৎ ছিল না ফিরুজার।

হঠাৎ একসময় ফিরে দাঁড়াল ফিরুজা। আর নিজেরই অজান্তে খোঁপা থেকে খুনিয়াটা তুলে এনে আবার খোঁপাতেই গুঁজে রাখল।

কিন্তু আকাশী কোথায়?

কোম্পানিমহলের মদের দোকানে গিয়ে নেশা করে নেশায় চুরচুর হয়ে টলতে টলতে চলে গিয়েছিল বনের দিকে। ঘন গভীর বনে। হরিণ শিকার করবার খেয়াল হয়েছিল হঠাৎ।

এ-সময় হরিণ শিকার করা খুব সহজ। খুনিয়া কি কোপাই লাগে না, তীর-ধনুক লাগে না। শুধু ফাঁদ পেতে রাখতে হয়।

বনের ভেতর থেকে ঝিরঝির করে যেখান থেকে জল নেমে আসছে খাল বেয়ে তার পাশেই একটা ছোট্ট খাদের মতো। হাত পনরো গভীর একটা কুয়োর মতো খাদ। তার মুখটায় পাটকাঠি কি সর বিছিয়ে তার ওপর কচি কচি নতুন পাতা এমনভাবে ছড়িয়ে রাখতে হয় যে দেখে মনেই হবে না তলায় খাদ আছে। খাটাস খরগোশ কি হরিণ বনশূয়োর বুঝতে না পেরে পাতার লোভে ছুটে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের ভারে পাটকাঠি সরকাঠি ভেঙে সবসুদ্ধ গিয়ে পড়ে খাদের ভেতর। তারপর শুধু দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে তুলে আনতে হয় শিকারটা।

যমনী আর আকাশী গিয়েছিল সেই লোভে। খাদের মুখে পাতা দিয়ে ঢেকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে কাটিয়েছে দুজনে। তারপর ফিরে এসেছে।

চাঁদনী রাত না হলে আসবে না হরিণ। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে

আপনা থেকেই ছুটে আসবে জলের ধারে। আর তখন কচি কচি পাতার লোভে গিয়ে পড়বে ফাঁদের মাঝখানে।

ফাঁদের মুখটা ঠিক ঠিক ঢাকা হয়েছে কিনা দেখে ফিরে এল আকাশী।

এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল।

না, কই কুপি জ্বলছে না তার ঘরে। আলো নেই।

আল্‌ভা কোথায় তবে ? এপাশ-ওপাশ খুঁজল আকাশী। ভাবল, কোথাও বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে লোকটা। কিন্তু না, কোথাও নেই।

তবে কি পাগল মানুষটা রাবা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ? কোথাও বসে বসে গান গাইছে নাকি নিজের মনে ? না, তার সেই মোহরের স্বপ্ন দেখছে ?

কথাটা মনে হতে ফিক করে হেসে ফেলল সে নিজের মনেই।

উননটার কাছে এসে কুপি জ্বাললে। কিন্তু কই, আল্‌ভা তো নেই !

একটু যেন ধাক্কা খেল আকাশী। প্রতিদিনই ফিরে এসে দেখেছে সে, কিছু না কিছু খাবার আছে তার জন্যে। কখনো কখনো আল্‌ভা নিজেও না খেয়ে বসে থাকত।

তা দেখে মনে মনে হাসত আকাশী।

আজ আর হাসতে পারল না সে। ,হঠাৎ সমস্ত বুকটা কেমন যেন দুলে উঠল।

ছুটে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। নিশ্চয় ফিরুজার কাছে গেছে আল্‌ভা।

কিন্তু ফিরুজার ঘর পর্যন্ত যেতে হল না। পথের মাঝখানেই দেখা

হয়ে গেল তার সঙ্গে।

অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল ফিরুজা, অনেক কড়া কড়া কথা শোনাবে ঠিক করে রেখেছিল। তবু কিছুই বলতে পারল না সে।

শুধু বললে, দীর্ঘশ্বাসের সুরে বললে, আকাশী! গায়েনভাই চলে গেছে রে, গায়েনভাই চলে গেছে।

—চলে গেছে? অবিশ্বাসের কণ্ঠে যেন চিৎকার করে উঠল আকাশী।

আর ফিরুজার গলার স্বর যেন কান্নার মতো শোনাল।

বললে, হাঁ রে আকাশী, মনে দুখ পায়েছিল গায়েনভাই, টিয়ারঙ ছাড়ে চলে গেছে।

তারপর কাপড়ের খুঁট থেকে ময়লা ছেঁড়া কাগজের টুকরোটা বের করে ফিরুজা বললে, ই লকশাটা তরে দিয়ে গেছে গায়েনভাই। লুকানো মোহরের লকশাটা তরে দিয়ে গেছে।

—লকশাটা? সব কথাগুলোই যেন দুর্বোধ্য ঠেকে আকাশীর কাছে। সব কথাগুলোই যেন অবিশ্বাস্য।

আল্‌ভা, গায়েন আল্‌ভা চলে গেছে? গুপ্তধনের নকশাটা তাকে দিয়ে চলে গেছে?

ফিরুজা কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, গায়েনভাই কয়েছে কি, ঘরের সোনাটাই রইল না ফিরুজা, ই মাটির সোনা লিয়ে কি হবে।

বিস্মিত বিস্ফারিত দুটি বড়ো বড়ো চোখ মেলে ফিরুজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আকাশী। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

চলে গেছে আল্‌ভা। চলে গেছে টিয়ারঙ ছেড়ে। কিন্তু তার গুপ্তধনের লোভে নয়, মনে দুঃখ পেয়ে চলে গেছে।

আপনা।ফিরুজা হাত বাড়িয়ে নকশাটা দিল আকাশীকে। দেখল আকাশীর দু-চোখ ভরে জল টলমল করছে।

ধীরে ধীরে নকশাটা হাতে নিল আকাশী, ধীরে ধীরে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠে ফিরুজাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল আর কাঁদল।

তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর পরমুহূর্তেই সমুদ্রের তীরের দিকে ছুটতে শুরু করল। উন্মাদ হরিণীর মতো।

টিয়ারঙের সমুদ্রের ঢেউ তখনো অবিরাম ছন্দে বেজে চলেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তীরের ওপর। যেন এক বিশাল বুকের অসীম বেদনা বার বার আছড়ে পড়ছে ব্যর্থতার মাটিতে। নীল সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সুশুভ্র ফেনার রাশি নয়, যেন ব্যথাক্রান্ত দুটি শান্ত চোখের কোণে উন্মাদ অনুভূতি আর সজল অশ্রু ঝরে পড়ছে বারংবার।

যতদূর চোখ যায় শুধু সমুদ্র, সমুদ্র।

ছোট্ট এইটুকু টিয়ারঙ দ্বীপ, আর অসীম বন্ধনহীন সমুদ্র। এ যেন আকাশীর জীবন। এ যেন মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

দ্বীপের বন্ধন অসহ্য মনে হয়, মুক্ত সমুদ্রের নেশায় পাগল হয়ে ছুটে যায় মানুষ। আবার একদিন সেই মুক্তির অসীম সমুদ্রে ভেসে ভেসে অসহ্য যন্ত্রণায় দ্বীপ খুঁজে ফেরে প্রতিটি মানুষ। আবার বন্ধন চায়, অসীম মুক্তির মাঝে গড়ে নিতে চায় নতুন বন্ধন, দ্বীপের বাঁধন।

সতরো

মানুষ বদলে গেল আকাশী। সেই ফুর্তির হাসি, সেই হালকা রঙ্গ মুছে গেল মুখ থেকে। আল্‌ভাকেই ভালোবেসেছিল সে, যম্‌নীকে নয়। যম্‌নীর মধ্যে পেয়েছিল রঙের নেশা, বিচিত্র এক উন্মাদনা। তাই নিজেরই অজান্তে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে সে আল্‌ভাকে। আল্‌ভার বিষাদ করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতুক বোধ করেছে।

কিন্তু ভালোবাসার মানুষ যতক্ষণ কাছে থাকে ততক্ষণ বুঝি বা তার মূল্য বোঝা যায় না। তাই আল্‌ভার অভাবে এমনভাবে তার সমস্ত জীবন নিঃস্ব হয়ে যাবে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি আকাশী।

সেই হাসি নিবে গেছে তার, সেই মোহ ভেঙে গেছে।

আল্‌ভা চলে যাওয়ার পরই তাই মানুষ বদলে গেল আকাশী। উদাস ব্যর্থতার ছায়া পড়ল মুখে চোখে। ক্রমে ক্রমে একটা ক্রূর কুটিল হাসি চমক দিল তার রহস্যময় দুটি চোখের তারায়। হাসি নয়, জ্বালা। আক্রোশে জ্বলে উঠল আকাশী। হয়তো নিজেরই বিরুদ্ধে, আপন নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে। হয়তো বা সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে। চ্যাটার্জি, টিয়ারঙ, যম্‌নী, কোম্পানিমহল—সব কিছুর ওপরই একটা প্রতিহিংসা নিতে চায় যেন।

এমনিই বুঝি হয়ে থাকে। যে নেশায় ভোলায়, নেশা ভেঙে গেলে তার ওপর আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশি হয়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রইল আকাশী। না, যম্‌নীর ডাকে সাড়া দেবে না আর। নাচবে না তার সঙ্গে জুড়ি বেঁধে। এমন কি বাবুপাড়ায় তাম্নুদিদির বিয়ের দিনেও নাচবে না। যম্‌নী যদি ডাকতে আসে, তো বলবে বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিতে।

টিয়ারঙের লোকগুলোকেও বুঝি ভুলে গিয়েছিল আকাশী। ভুলে গিয়েছিল টিয়ারঙীদের।

সবাই তাই চমকে উঠল আকাশীকে দেখে।

প্রতিদিনের মতোই আগুন জ্বালিয়ে ঘিরে বসে ছিল সকলে। মদ্না, ফিরুজা, যম্নীর বুড়ো বাপ আর বুধা। আরো অনেকে।

টিয়ারঙীরা সকলেই এসে হাজির হয়েছে, দেখলে আকাশী। বুঝল, কিছু একটা ঘটেছে। কোনো একটা চাঞ্চল্য।

গঞ্জমাঝিদের একজন বলছিল কি যেন। আকাশীকে আসতে দেখে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা।

গঞ্জমাঝি বলছিল, লড়াই লেগেছে কোথায়।

গঞ্জমাঝিদের কয়েকটা ডিঙি নাকি ফিরে এসেছে। গঞ্জে যেতে পায়নি তারা, মাল বেচতে পায়নি। যেতে দেয়নি তারা টিয়ারঙীদের। কেন, তা ভালো করে বুঝতেও পারেনি গঞ্জমাঝিরা। শুধু শুনেছে, লড়াই লেগেছে ওদিকে কোথায়।

শুনে ভেতরে ভেতরে খেপে উঠেছে তারা। শুধু গোরা পল্টনদের ওপরই নয়, স্টিফেন্স কোম্পানির বাবুদের ওপরও। গঞ্জে মাল বেচতে না পেলে খাবে কি তারা। গোরা পল্টন আর কোম্পানির বাবু— সবই মাটির লোক। মাটির লোকগুলোই তাদের খাবার কেড়ে নিচ্ছে। দু-একজন গঞ্জমাঝি শুনে এসেছে, ওদিকের দ্বীপগুলো থেকে সব ধান কেড়ে নিয়ে গেছে মাটির লোক এসে। আতঙ্কে শিউরে উঠেছে সে-কথা শুনে। ভয় পেয়েছে, হয়তো তাদের ধানগুলোও কেড়ে নিয়ে যাবে।

তাই ভেতরে ভেতরে গুমরে ওঠে সকলে। স্টিফেন্স কোম্পানির লোকগুলোকে টিয়ারঙে আসতে দিয়ে বুঝি ভুলই করেছে।

বস্তির একপাশে আগুন ঘিরে বসে সবাই। বসে আলোচনা করে, কি করবে তারা, কি করা উচিত।

মাধো সর্দারকে যখন বন্দুকের গুলিতে খুন করেছিল বাবুটা, তখনই জটলা পাকিয়েছিল তারা। খুনিয়া আর কোপাই নিয়ে তাড়া করে যাবে, ভেবেছিল। কিন্তু পারেনি। কেউ কেউ পয়সার লোভ দেখেছিল, কাজ পাবে কোম্পানির কাছে, খেয়ে পরে বাঁচবে স্বপ্ন দেখেছিল।

কিন্তু কই, সারা দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও তো কপাল বদলাতে পারল না তারা। বরং অভাব বেড়েছে তাদের। ঘরে চোলাই করে পচাইয়ের নেশায় মন ভরত আগে, এখন সকলেই ছুটে যায় কোম্পানি-এলাকার মদের দোকানটায়। রোজের টাকা চলে যায় মদের দোকানে, কলের কাপড় কিনতে। ক্ষেতে পুরো ধান হয় না আর আগের মতো, কিনতে হয় পয়সা দিয়ে।

ভেতরে ভেতরে তাই আগুন জমা হচ্ছিল। দপ্ করে জ্বলে উঠল তারা একটা খবরে।

ঝড়ে ঘর ভেঙে পড়লে বন থেকে গাছ কেটে এনে বাড়ি বানাত তারা, ডিঙি বানাত বনের কাঠ দিয়ে। জ্বালানি কুড়িয়ে আনত বন থেকে।

কোম্পানি নির্দেশ দিয়েছে, বনের একটা গাছও আর কাটতে পাবে না কেউ। জ্বালানি কুড়োতে পাবে না।

কোম্পানির নির্দেশ নয়, সরকারী নিষেধ। আর সে-নিষেধ মানছে কিনা দেখবার জন্যে এসেছে বনপুলিশের দপ্তর, জঙ্গল-দারোগা।

কোম্পানি আর সরকার, দুই সমান টিয়ারঙীদের চোখে। মাটির

লোক ওরা, এসেছে দ্বীপের লোকগুলোর ওপর অত্যাচার করবার জন্যে। কিন্তু টিয়ারঙীরা গোলাম নয় ওদের। কোম্পানির কাজ করে টাকা নেয়, ভিক্ষে নয়।

সব শুনে খেপে উঠল মদ্‌না আর ফিরুজা। রাগে চিৎকার করে উঠল আকাশী।

হাতে খুনিয়া তুলে বললে, বারণ মানবো নাই উদের।

সকলেই আশ্চর্য হল। এমনটি যেন আশা করেনি কেউ। আকাশীও রেগে গেছে কোম্পানির আইন শুনে। হ্যাঁ, মাধো কোলাসোর মেয়ে বটে আকাশী। তার শরীরেও তাহলে টিয়ারঙের রক্ত আছে।

পুরুষগুলোও কোপাই তুলে তাই চিৎকার করে উঠল, সব গাছগুলান কাটে দিবো। পুড়ায় দিবো।

হ্যাঁ, সব গাছ কেটে ফেললে, পুড়িয়ে দিলে কিসের লোভে থাকবে লোকগুলো। চলে যাবে তারা। চলে যেতে বাধ্য হবে, আর শান্তি পাবে টিয়ারঙীরা। আবার নতুন বন হবে তাদের, আগেকার মতোই ধান বুনে আর মাছ ধরে দিন কাটবে তাদের।

কিন্তু চ্যাটার্জি যদি বন্দুক নিয়ে ছুটে আসে আগের মতো? যদি মাধো সর্দারকে যেভাবে মেরেছে সেইভাবে তাদেরও গুলি করে?

হাসল আকাশী।—কতগুলা বন্দুক আছে উদের? আমরা মানুষ অনেক আছি।

তা ঠিক। এতগুলো মানুষকে মারবার মতো বন্দুক নেই ওদের।

রাতের অন্ধকারে আগুন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলল। না, এভাবে ধীরে ধীরে টিয়ারঙকে গ্রাস করতে দেবে না তারা। কোম্পানির আইনকে

রোধ করবে সমস্ত শক্তি দিয়ে, প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়ে।

আকাশী খুনিয়া তুলে চিৎকার করে উঠল।—বন আমাদের বটে, বনের গাছগুলাও আমাদের।

সবাই ঘাড় নেড়ে সায় দিল তার কথায়।

আকাশী বললে, গাছ কাটবো কাল, হুকুম মানবো নাই।

সবাই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, মানবো নাই।

পরের দিন সত্যিই দল বেঁধে গাছ কাটতে শুরু করল টিয়ারঙীরা। কোপাই পড়তে শুরু করল গুঁড়ির পায়ে।

একটার পর একটা গাছ কেটে চলে তারা। বিরাট বিরাট গুঁড়িগুলো লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আর সমস্বরে সকলেই চিৎকার করে ওঠে, হুকুম মানবো নাই।

এদিকে খবর পৌঁছে গেল চ্যাটার্জির কাছে। পাঠক ছুটে এল।

বললে, কোম্পানির হুকুম গাছ কাটতে পাবে না কেউ।

শুনে অট্টহাসি হেসে উঠল টিয়ারঙীরা।—গাছ কাটবো নাই তো কোপাইটা বেকার হবে? তুদের কাটবো তবে।

চমকে উঠল পাঠক, তাদের চোখে নৃশংস উল্লাস দেখে।

বললে, বুড়ো মাধো সর্দার হুকুম না শুনে যেমনভাবে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে তেমনিভাবে প্রাণ দিতে হবে টিয়ারঙীদের, আইন না মানলে।

তা শুনে সুপ্ত প্রতিহিংসাটা যেন জ্বলে উঠল আকাশীর বুকে। খুনিয়া নিয়ে তাড়া করে গেল সে পাঠককে।

ভয়ে ছুটে পালাল পাঠক। কি আশ্চর্য, যে নাচনী মেয়েটা যৌবন কাঁপিয়ে তাদের মন ভোলাত এতদিন সেও এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে

লোক্কেন ? কোন আক্রোশে ?

এদিকে যম্‌নী কোনো খবরই রাখেনি, টিয়ারঙের মনে কি ঝড় এসেছে না এসেছে। বার বার এসে ফিরে গেছে সে, দেখা পায়নি আকাশীর।

হঠাৎ এমন পরিবর্তন যে আসতে পারে আকাশীর, ভাবতেও পারেনি।

প্রতিদিনের মতোই সেদিনও এল সে আকাশীর খোঁজে। দেখা হয়ে গেল মাঝপথেই।

এক মুখ হেসে এগিয়ে এল যম্‌নী।—আরে নাচনী হামার, কাঁহা ছিলি তু ইতনা দিন, তোকে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে···

বলতে বলতে সপ্রতিভভাবেই আগের মতো আকাশীর হাত দুটো ধরতে গেল যম্‌নী।

স্পর্শ বাঁচাবার জন্যেই যেন পিছিয়ে এল আকাশী। তা দেখে কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেল, হেসে উঠে অস্বস্তি কাটাতে চাইল যম্‌নী।

বললে, নাচনী আছিস কি দুসরা কেউ।

আকাশীর সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠল। যে-আক্রোশটা সুপ্ত ছিল তার মনের মধ্যে তা যেন জেগে উঠল হঠাৎ। কঠিন স্বরে বললে সে, আমি নাচনী হব নাই আর, জুড়ি বাঁধবো নাই তোর সাথে।

—হাঁ ? নাচেগা নাই ? বিস্মিত হল যেন যম্‌নী।

—না, নাচবো নাই, জুড়ি বাঁধবো নাই তোর সাথে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল যম্‌নী।—নাচেগা নাই তো ফাটক হবে। রূপেয়া আগাম লিয়েছিস না বাবুদের কাছে।

—টাকা তুই লিয়েছিস।

হাসল যমুনী।—হাঁ, হাঁ, লেকিন নেশা তো তু করেছিস উ রূপেয়ায়। নাচ না দিখালে হামারও ফাটক হবে।

আকাশী রেগে গেল। বললে, তোর ফিরুজার সাথে জুড়ি বাঁধবি যা ক্যানে, তোর বেটাকে নাচ শিখাবি যা ক্যানে। আমি আর নাচবো নাই।

বলে তরতর করে অন্য পথ ধরে চলে গেল।

আর তার যাওয়ার পথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল যমুনী। যেন ঠিক বুঝতে পারছে না সে মেয়েটাকে, যেন অবোধ্য মনে হচ্ছে তার ব্যবহার।

মুহূর্ত কয়েক কি যেন ভাবল সে, তারপর হাঁটতে শুরু করল তার বুড়া বাপের ডেরাটার দিকে।

এসে দেখল তেমনি বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে বুড়ো, আর দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার। নিজের মনেই কাঁদছে।

এদিক-ওদিক তাকাতেই ফিরুজাকেও দেখতে পেল। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে গল্প করছে সে বুধার সঙ্গে। আর তার কোলের বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে আদর করছে বুধা।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল যমুনী। মন ভরে গেল তার বুধা আর ফিরুজার হাসিহাসি মুখের দিকে তাকিয়ে।

ধীরে ধীরে বুড়োর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, বেটাকে লিয়ে যায়গা বুড়া, নাচ শিখায়গা।

চমকে ফিরে তাকাল ফিরুজা, তার কথা শুনে। বুড়োও ছানি-পড়া দুটো চোখ তুলে খুঁজল যমুনীকে। জিগ্যেস করলে, কে

যম্‌নী বটিস ?

—হাঁ।

বুধাকে ততক্ষণে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আতঙ্কের চোখ তুলে তাকিয়েছে ফিরুজা। তার দিকে যম্‌নী ফিরে তাকাতেই চিৎকার করে উঠল সে।—না দিবো নাই বুধা, নাচ শিখাতে দিবো নাই।

হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল যম্‌নী।—তুম চলো, তুম ভি নাচো।

বিস্ময়ে যম্‌নীর মুখের দিকে তাকাল ফিরুজা। লোকটা কি পাগল হয়ে গেছে নাকি।

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।—হাঁ, নাচবো আমি, নাচনী হবো। কিন্তু বুধাকে নাচ শিখাবি না তুই।

আঠারো

ফিরুজা জুড়ি বেঁধেছে যম্‌নীর সঙ্গে, ফিরুজা নাচ দেখাবে তামুদিদির বিয়ের রাতে। নৃশংস রহস্যের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আকাশীর মুখ। আজ সব হারিয়ে বাপ মাধো সর্দারের অভাবটা নতুন করে বুঝতে পারে আকাশী। দিনের পর দিন চ্যাটার্জিকে বন্দুক কাঁধে নিয়ে যেতে দেখেছে সে বনের দিকে। রহস্যের চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের সামনে যেন সেই পুরনো দিনের দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে।

ঐ বন্দুকের গুলিতে খুন হয়েছিল তার বাপ মাধো সর্দার।

আজ বহুদিন পরে তার শিরা-উপশিরায় আবার সেই নৃশংস রক্তটা নেচে উঠল।

যম্‌নীর ওপর আক্রোশে জ্বলে উঠেছিল আকাশী। তার শান্ত রক্তে নেশার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল যম্‌নী। আর নেশাকে দিনের পর দিন বাঁচিয়ে রেখেছিল ঐ মাটির মানুষগুলো। কোম্পানিমহলের কুলিকামিন, বাংলোপাড়ার বাবুরা। আজ মনে হল সব অভিশাপের জন্যে দায়ী ঐ বন্দুক-হাতে চ্যাটার্জি, যাকে এতদিন তারা টিয়ারঙের রাজা ভেবেছিল।

বাপ মাধো সর্দারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়েও খুনিয়ায় হাত ওঠেনি আকাশীর, শুধু টিয়ারঙীদের নিষেধে। বন্দুকের গুলিকে সেদিন ভয় পেয়েছিল টিয়ারঙীরা। আর আল্‌ভাকে ঘিরে শান্তির স্বপ্ন দেখেছিল আকাশী।

আল্‌ভার রক্তে উন্মাদনা আনবার জন্যেই নাচের জুড়ি বেঁধেছিল সে যম্‌নীর সঙ্গে। ঈর্ষার শিখা জ্বালিয়ে আলভাকে জাগিয়ে তুলতে

চেয়েছিল। কিন্তু নাচের অভিনয় করতে করতে কবে যেন অভিনয় ভুলে নাচের ঘূর্ণিতে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিল আকাশী।

আজ আবার আক্রোশে জ্বলে উঠল আকাশী। না, ফিরুজাকে জুড়ি বাঁধতে দেবে না সে। যম্‌নীর নেশায় হয়তো তার মতোই ফিরুজাও ভুলেছে। মদ্‌নার সুখের সংসার নষ্ট হতে দেবে না।

যতবার আল্‌ভার কথা ভাবে ততবারই ব্যথার মোচড় দিয়ে ওঠে তার ছোট্ট বুকে। স্বপ্নের ঘোরে যেন পুরনো দিনের দৃশ্যগুলো ভেসে ওঠে চোখের সামনে। রাবা হাতে আল্‌ভা বুঝি বা এখনো গান গাইছে, করুণ মিঠে সুর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

স্মৃতির তারে টুংটাং সুর বাজে। গভীব একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আকাশীর হৃদয় নিঙড়ে।

আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে সে আল্‌ভাকে। নাচের নেশায়, টাকার লোভে, যম্‌নীর চোখের রঙে সব ভুলে গিয়েছিল আকাশী। বুঝতে পারেনি তার জীবন কানায় কানায় ভরে আছে আল্‌ভাকে ঘিরেই। তাই আল্‌ভা চলে গেছে, এ-খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত জীবন যেন শূন্য হয়ে গেল, তার সমস্ত হৃদয় যেন নিঃস্ব হয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। প্রতিহিংসার উষ্ণ শোণিত চঞ্চল হয়ে উঠল তার শিরা-উপশিরায়।

কি যেন ভাবল আকাশী। তারপর হঠাৎ একসময় নিজের মনেই হেসে উঠল।

বাবুবাংলোর ওদিক থেকে কি একটা গান ভেসে আসছে। কলের গান বাজছে ছুটদিদিদের বাড়িতে। ত্রিপল টাঙানো হয়েছে, লতায়

পাতায় সুন্দর করে সাজানো হয়েছে বাড়িটা। আলোর সারি ঘিরে আছে সমস্ত বিবাহ-মণ্ডপ।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। চিৎকার আর হট্টগোল শোনা যাচ্ছে ওদিকে।

নতুনবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে তামুদিদির, তাদের ছুটদিদির। টিয়ারঙের বাবুপাড়া ভেঙে পড়েছে তাই চ্যাটার্জির বাড়িতে।

ককিয়ে কেঁদে উঠেছে সানাইয়ের স্বর। সে-স্বরে কেমন যেন উদাস হয়ে ওঠে আকাশীর ভাঙা মন। অবোধ্য এক ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে।

ওভারসিয়ার পাঠকের কাছ থেকে আগাম নিয়ে বসে আছে যমনী। ছুটদিদির বিয়েতে সারা রাত নাচতে হবে।

হয়তো অপেক্ষা করে আছে যমনী।

ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে এল আকাশী। হ্যাঁ, নাচতে হবে তাকে। যমনীর সঙ্গে জুড়ি বেঁধে সারা রাত নাচবে সে। চোখ ঝলসে দিতে হবে বাবুদের।

রঙবেরঙের নতুন ঘাগরাটা পরল আকাশী। রক্তের মতো লাল ঘাগরার গায়ে কালো আর হলুদের নকশা চমক দিল। বুকের উল্লাসে কাঁচুলির বাঁধন ঘিবে তার কালো চুলের পাশ দিয়ে জড়িয়ে নিল গোলাপী ওড়না।

মুখে রঙ, চোখের কোণে কাজল টানল। নিজেকে সাজাল আকাশী সুন্দর করে।

ছোট্ট আয়নাটায় বার বার নিজের রূপ দেখল। মনে হল, যেন টিয়ারঙের সবচেয়ে সুন্দরী সে। যেন তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে

চায় টিয়ারঙের প্রতিটি পুরুষ।

পায়ে রিঠের ঘুঙুর বেঁধে নিল আকাশী, হাতে নিল নাচের ঢোলক।

তারপর ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দ তুলে অন্ধকারের পথ ধরে বাবুবাংলোর দিকে এগিয়ে চলল সে।

মাঝপথেই দেখা হয়ে গেল যম্‌নীর সঙ্গে। ফিরুজার ঘরের দিকে চলেছে সে। অদ্ভুত পোশাকে সেজেছে সেও। রঙিন কুর্তা গায়ে, মাথায় পেখম।

দেখা হতেই একমুখ হেসে এগিয়ে এল আকাশী।—নাচ দিখাতে হবে না আজ, তোরেই তো খুঁজছি সারাদিন।

খুশি হয়ে উঠে হাসল যম্‌নী।—আরে কাঁহা গিয়েছিলি পিয়ার, তুমারে ঢুন ঢুনকে তো হয়রান হয়ে গেলাম।

রহস্যময় মধুর হাসি হেসে যম্‌নীর হাতের সঙ্গে নিজের হাতটা লতার মতো জড়িয়ে দিল আকাশী। গায়ে ঢলে পড়ে বললে, আমি তো তুমারেই খুঁজতেছি গো!

—হাঁ? বিস্ময়ে হাসল যম্‌নী। তারপর হঠাৎ আকাশীর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তার রঙিন পোশাক, ঝকঝকে মুখখানার দিকে তাকিয়ে বললে, তুম তো হামারা দিল্‌মে খুনিয়া বসায় দিছিস! বলে হো হো করে অট্টহাসে হেসে উঠল যম্‌নী, নিজেরই রসিকতায়।

আকাশী হেসে বললে, আরে ই টিয়ারঙীদের চোখেই খুনিয়া দেখিস? হাতেও খুনিয়া চমক দেয়!

আবার হেসে উঠল যম্‌নী।

তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটল বাবুবাংলোর দিকে। না, আকাশীই এসেছে নাচতে, নিজে থেকেই এসেছে। ফিরুজাকে চায়

না যম্‌নী।

ফাঁকা মাঠে খানিকটা জায়গা বঁাশ দিয়ে ঘেরা হয়েছে তখন। সামনে কুলিকামিনদের ভিড়। কে একজন তাসের খেলা দেখাচ্ছে, আর তা দেখে হইহই করে উঠছে সকলে।

যম্‌নী আর আকাশীকে আসতে দেখেই হল্লা করে দাঁড়িয়ে উঠল সকলে। চিৎকার শুরু করল। কেউ কেউ অশ্লীল রসিকতা করলে।

আকাশী হাসল রসিকতা শুনে। এমন অনেক শুনেছে সে, অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

যম্‌নীর পাশে পাশে এসে এক জায়গায় বসল দুজনে। তাসের খেলা দেখতে শুরু করলে।

তাসেব খেলা শেষ হলে নাচ শুরু হবে।

কিন্তু লোকগুলো ক্রমশই অধৈর্য হয়ে ওঠে।

এদিকে আকাশী চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখে, কি যেন খোঁজে। না, টিয়ারঙারা কেউ আসেনি।

দ্বীপ থেকে নাকি মাটির মানুষগুলোকে তাড়িয়ে দিতে চায় টিয়ারঙারা। বন পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়। তাদের বন, তাদেরই গাছ, অথচ বাবুরা নাকি হুকুম দিয়েছে ঘর মেরামত করবার জন্যেও তারা গাছ কাটতে পাবে না।

বনের গাছ যতদিন বাবুরাও নিয়েছে, তারাও পেয়েছে, ততদিন রাগ ছিল না কারো। কিন্তু একে একে সব বুঝি ছিনিয়ে নিতে চায় কোম্পানি। তাদের জঙ্গলের গাছ কিনা কিনতে হবে কোম্পানির কাছ থেকে!

হঠাৎ একটা হল্লা হতেই তন্ময়তা ভেঙে গেল তার।

তাসের খেলা হয়েছে, এবার শুরু করতে হবে তার নাচ। পায়ে রিঠের ঘুঙুর বেজে উঠল ঝুমঝুম করে। উঠে দাঁড়াল আকাশী, হাতের ঢোলক বাজিয়ে, শরীরের ছন্দ নাচিয়ে।

উদ্দাম যৌবনের শরীরে লুব্ধতার হিল্লোল। অপরূপ একটি স্বাস্থ্য-ভরা দেহ নয়, যেন তরঙ্গ উত্তাল একটি সমুদ্র। নাচের ছন্দ নয়, যেন কামনার তটে ভেঙে পড়ছে এক একটি মাংসের ঢেউ। সমুদ্রের মতো রহস্যময়, সমুদ্রের মতো উন্মাদ, সমুদ্রের মতো ছন্দময়। নাচের ঘূর্ণিতে উন্মাদ হয়ে ওঠে আকাশী। রক্তলাল ঘাগরা উড়ে পড়ে, ওড়না ভেসে বেড়ায়, ঘুঙুর বেজে চলে অবিরাম, আর আকাশীর হাতে ঢোলক বেজে ওঠে উদ্দাম হয়ে।

অদ্ভুত পোশাক পরে ধীরে ধীরে যম্‌নীও এসে জুড়ি বাঁধে আসরের মাঝখানে। আর নাচের তালে তালে গানের কলি ছুঁড়ে দেয় আকাশী।

আনন্দে ফুর্তিতে চিৎকার হট্টগোল করে ওঠে দর্শকের দল।

যম্‌নী নিজেও যেন বিস্মিত হয়। কামবিমুগ্ধা হরিণীর মতো আত্মহারা আনন্দে নেচে চলেছে আকাশী। তার চোখের প্রতিটি তির্যক্ ইঙ্গিত যেন রহস্যময়, প্রতিটি কটাক্ষ যেন রসে উদ্বেল।

নাচের নেশায় বুঝি সব ভুলে গেছে আকাশী। বুঝি আল্‌ভাকেও ভুলে গেছে।

ওদিকে সানাই সুর ধরেছে বাবুবাংলোয়।

এক চক্র নেচে এসে আসরের একপাশে বসল যম্‌নী আর আকাশী। কুলিকামিনদেরই কে একজন হারমোনিয়ম নিয়ে গান শুরু করেছে। ততক্ষণ বিশ্রাম নেবে দুজনে।

গান শেষ হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরেই। আবার নাচ চাই, নাচ।

ওদিকে বাবুবাংলো থেকে শাঁখের আওয়াজ আসছে। বিয়ে হচ্ছে তামুদিদির, নতুনবাবুর সঙ্গে তামুদিদির বিয়ে হচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল আকাশীর, কেমন যেন উদাস।

হয়তো ক্ষণিকের জন্যে আল্‌ভার কথা মনে পড়ল।

কিন্তু মনের খোঁজ রাখে না দর্শকের দল। নাচ চায় তারা, নাচ।

চিৎকার করে উঠল সকলে। তা শুনে ইশারা করল যম্‌নী। আসরে নামতে হবে।

আকাশীর শরীর যেন ক্লান্ত। নাচের মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে বললে সে, টুকুন নেশা না করলে লাচতে পারবো নাই।

নেশা? ঠিকই তো, নেশা না হলে কি নাচা যায়।

যম্‌নীর কথা শুনে একটা বোতল এনে দিল কে একজন। ঢকঢক করে তার খানিকটা খেয়ে নিল যম্‌নী, বাকীটা গলায় ঢেলে দিল আকাশী। মুহূর্তে কান গরম হয়ে উঠল তার, শরীরে ফুর্তি এল।

ঝুমঝুম ঝুমঝুম ঘুঙুর বেজে উঠল আবার। আসরে নামল যম্‌নী আর আকাশী। রক্তলাল ঘাগরা উড়ল, ঢোলক বাজল ডুমডুম ডুমডুম। উদ্দাম যৌবনের হিল্লোল, উদ্ধত কাঁচুলির স্পন্দন। নাচের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে যেন আকাশী, ঘূর্ণির মতো ঘুরছে ঘাগরার মগজি। দেহের ছন্দ নয়, যেন উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গ, অরণ্যের উন্মাদ ঝড়তুফান।

ঘন ঘন বাহবা দেয় দর্শকের দল। আর যম্‌নীর সঙ্গে জুড়ি বেঁধে নানা বিচিত্র ছন্দে, নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে নেচে চলে আকাশী।

কেউ বুঝতে পারে না আকাশীর মনের মধ্যে কি ঝড় উঠেছে।

নাচের নেশায় সব যেন ভুলে গেছে আকাশী। নাচের ঘূর্ণিতে সবাই বুঝি মেতে উঠেছে।

আবার একবার বাহবা দিতে গিয়েই হঠাৎ যমুনীর চিৎকার শুনে থেমে গেল দর্শকের দল। বিস্ময়ে, দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকাল তারা। এটাও নাচের একটা অঙ্গ কিনা বুঝতে পারছে না যেন।

না, নাচ নয়। অভিনয় নয়।

উন্মাদের মতো নেচে চলেছিল যমুনী আর আকাশী। ডুমডুম ডুমডুম বেজে চলেছিল আকাশীর হাতের ঢোলক। বেজে চলেছিল ঘুঙুরের বোল।

এমন সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল যমুনী। তারপরই লুটিয়ে পড়ল সে আসরের ওপর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

বিভ্রান্ত দর্শকের দল হইহই করে উঠে দাঁড়াল। নাচতে নাচতে হঠাৎ কখন লুকিয়ে রাখা খুনিয়া বের করে বসিয়ে দিয়েছে আকাশী। আমূল বসিয়ে দিয়েছে যমুনীর বুকে।

ভিড় ভেঙে পড়ল আসরের ওপর। কিন্তু তার আগেই ছুটতে শুরু করেছে আকাশী।

কয়েকজন তার পিছনে পিছনে ছুটে গেল। কিন্তু টিয়ারঙী মেয়েদের সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন তারা। দ্রুত মিলিয়ে গেল আকাশী অন্ধকারের মধ্যে।

অন্ধকার ঘন গভীর বনের দিকে ছুটন্ত একজোড়া ঘুঙুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

উনিশ

ফিসফাস কানাঘুষো শুরু হয়েছিল প'রের দিন সকাল থেকেই। চ্যাটার্জির কানে এসে পৌঁছল সন্ধ্যের দিকে।

খবর শুনেই দপ্ করে জ্বলে উঠল চ্যাটার্জি। টিয়ারঙীদের সাহস যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রেঞ্জারের নির্দেশ অমান্য করে বার বার তারা কমবয়েসী গাছ কেটেছে নিজেদের প্রয়োজনে। কোম্পানির ইজারা নেওয়া বনের গাছ কেটে নিয়ে গেছে ঘরদোর বানাবার জন্যে। নিষেধ শোনেনি। কিন্তু এমনভাবে বনে আগুন লাগিয়ে দেবে তারা, কল্পনাও করেনি কেউ।

বুড়ো মাধো সর্দারের মৃত্যুর পর তাহলে টিয়ারঙীরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। আগুনটা ভেতরে ভেতরে চাপা ছিল শুধু।

চ্যাটার্জি শুনল, খুনিয়া কোপাই তীর-ধনুক নিয়ে সব নাকি সাজ সাজ রব তুলেছে। কোম্পানির লোকগুলোকে, 'মাটি' থেকে যারা এসেছে তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে মেয়েপুরুষ সকলেই নাকি তৈরি হচ্ছে।

প্রথমটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল চ্যাটার্জি।

ওভারসিয়ার পাঠক খবরটা শুনেই ছুটে এল চ্যাটার্জির কাছে। সারাটা রাত কেটেছে বিয়ের হইহল্লায়। তার ওপর নাচওয়ালা যমুনীকে খুন করে পালিয়েছে নাচনী মেয়েটা। আসরের মাঝখানে খুন হয়েছে, তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিল সকলে। টিয়ারঙের বনেজঙ্গলে কি হচ্ছে তার হিসেব রাখেনি।

কিন্তু পরের দিন বিকেল থেকেই খবর আসতে শুরু হল কুলিকামিনদের কাছ থেকে।

কিছু একটা ষড়যন্ত্র যদি না থাকবে তো টিয়ারঙীরা আসেনি কেন নাচ দেখতে, তাসের খেলা দেখতে, গান শুনতে ?

বিয়ের রাতে অনেক দূরে বনের একদিকটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেছে কেন ?

কাজে আসেনি কেন টিয়ারঙীরা ?

অমিয়বাবু ভয় পেয়ে গেলেন, পাঠক ভয় পেয়ে গেল। না, চ্যাটার্জি সাহেবের কানে তুলতে হবে কথাটা।

অমিয়বাবু শুধু বললেন, আর এ নিয়ে গোলমাল করে লাভ নেই পাঠক। দিনকয়েকের মধ্যেই জাহাজটা এসে পৌঁছচ্ছে। টিয়ারঙ তো ছেড়ে যেতে হবে সকলকে।

পাঠকও জানে সে-খবর। যুদ্ধ এগিয়ে আসছে এদিকে। তাই সরকারী নির্দেশ এসেছে টিয়ারঙ ছেড়ে চলে যেতে হবে সকলকে।

ওদিকের কোন একটা দ্বীপে নাকি বোমা পড়েছে। টিয়ারঙেও পড়তে পারে।

পাঠক বললে, কথাটা ঠিকই বলেছেন অমিয়বাবু, কিন্তু লড়াই তো দু-চার রোজ বাদেই থেমে যাবে। তখন তো ফিরতে হবে আবার।

শেষ পর্যন্ত চ্যাটার্জি সাহেবের কাছে খবরটা পৌঁছে দেওয়াই ঠিক হল।

শুনল চ্যাটার্জি। শুনেই দপ্ করে জ্বলে উঠল রাগে।

বিয়েবাড়ির রেশ তখনো শেষ হয়নি। সকলেই ক্লান্ত। গত রাত্রির উৎসবশেষের অবহেলা প্রতিটি কোণে।

কিন্তু চ্যাটার্জির কাছে দায়িত্ব অনেক বড়ো। এভাবে দিনের পর দিন একটার পর একটা বন পুড়িয়ে নষ্ট করতে দেবে না সে

টিয়ারঙীদের।

কোনো কথা না বলে ঘরের ভেতর থেকে বন্দুকটা বের করে আনল চ্যাটার্জি। তারপর জঙ্গলের দিকে পা বাড়াতে গেল।

—একা যাবেন সার! বিস্মিত হল পাঠক।

হাসল চ্যাটার্জি।—হ্যাঁ।

পাঠক বললে, তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

—না। রূঢ় কঠিন স্বরের উত্তর এল।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকাল পাঠক। বলে কি লোকটা! এই একটা বন্দুক নিয়ে লড়তে যাবে একদল বুনো টিয়ারঙার সঙ্গে?

চ্যাটার্জি কোনো কথা বলল না আর। লম্বা লম্বা পা ফেলে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে এগিয়ে চলল বনের দিকে। আর দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল পাঠক, তাকিয়ে রইলেন অমিয়বাবু।

ধীরে ধীরে চ্যাটার্জির সুদীর্ঘ চেহারার ছায়াশরীর মিলিয়ে গেল দূরের অন্ধকারে।

পাঠক বললে, না অমিয়বাবু, এভাবে চ্যাটার্জি সাহেবকে একা যেতে দেওয়া উচিত হবে না। চলুন, কুলিদের একটা দলকে ডেকে নিয়ে আমরা পিছনে পিছনে যাই।

—তাই চলুন। বললেন অমিয়বাবু।

দ্রুতপায়ে কুলিবস্তির দিকে ছুটল পাঠক। কোম্পানি বস্তির বেশ কিছু লোক নিয়ে যেতে হবে—চ্যাটার্জি সাহেবের পিছনে পিছনে।

এদিকে বন্দুক হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘন গভীর বনের দিকে এগিয়ে চলে চ্যাটার্জি। জঙ্গলের যেদিকটায় তখনো শিখা উঠছে থেকে থেকে সেই দিকে। লেলিহান কয়েকটা শিখা আর ধোঁয়ার

কুণ্ডলী উঠছে।

দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছে। আর মাঝে মাঝে ডুগডুগির শব্দ চঞ্চল হয়ে উঠছে। যেন উল্লাসে বিকট চিৎকার করে উঠছে টিয়ারভীর দল।

ঈষৎ চন্দ্রালোকের অস্পষ্ট আলোয় পথ চিনে চিনে এগিয়ে চলে চ্যাটার্জি। খালের পাড় ধরে। কুলকুল স্বরে জল বইছে খালে। চাঁদের ছায়া পড়েছে তার ওপর।

এদিকে ঘন বনে অদ্ভুত কি একটা পাখির চিৎকার।

হঠাৎ বনঝোপের পাশ থেকে কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। রহস্যময় নারীকণ্ঠের উচ্চকিত হাসি।

থমকে দাঁড়াল চ্যাটার্জি। এদিক-ওদিক তাকাল দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে। না, আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। হয়তো কোনো বুনো পাখির চিৎকার।

আবার চলতে শুরু করল চ্যাটার্জি।

কিন্তু দু-পা না এগোতেই আবার খিলখিল করে কে যেন হেসে উঠল।

এবার আর বিস্ময় নয়। গা ছমছম করে উঠল চ্যাটার্জির। একটা ধূর্ত চিতাবাঘ যেন তার অলক্ষ্যে থেকে তাকেই লক্ষ্য করে চলেছে। যেন সেই বাঘিনীর মর্জির ওপর নির্ভর করছে চ্যাটার্জির জীবন। যে কোনো মুহূর্তে বুঝি লাফ দিয়ে পড়তে পারে।

তবু মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে চলতে শুরু করে চ্যাটার্জি। অথচ থেকে থেকে সেই রহস্যের হাসি বেজে ওঠে, নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে চ্যাটার্জি।

হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় চ্যাটার্জি। চিৎকার করে ওঠে, কে? কে তুই?

মুহূর্তের মধ্যে হাসি থেমে যায়। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোনো শব্দ নেই, কোনো কথা নেই।

আবার যেই চলতে শুরু করে চ্যাটার্জি সশব্দ হাসি ভেসে আসে পাশ থেকে।

শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় চ্যাটার্জি, চিৎকার করে বলে, কে, কে তুই।

পরমুহূর্তে ঠিক উলটো দিক থেকে কে যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে।

সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, যেদিকেই ছুটে যায়, অশরীরী প্রেতাত্মার মতো ছায়াশরীর মিলিয়ে যায়, আর ক্ষণপরেই বিপরীত দিক থেকে উচ্চকিত হাসির আওয়াজ ভেসে আসে।

বিভ্রান্ত চ্যাটার্জি উন্মাদের মতো ছুটে বেড়ায়। স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ে তার কপাল থেকে।

ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চ্যাটার্জি। কি যেন ভাবে। তারপর দূরে যেখানে বনের প্রান্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

আর সেই মুহূর্তে একটি নারীর রহস্যময় ছায়াশরীর এসে দাঁড়ায় সামনে। খিলখিল হাসির সুরে প্রশ্ন করে, পথ হারাইছিস রে বাবু?

—কে, কে তুই? দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে চ্যাটার্জি। বুঝি ধরে ফেলতে চায় রহস্যে ঘেরা মেয়েটিকে।

কিন্তু তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে টিয়ারঙী মেয়েটা।

আবার চলতে শুরু করেছে চ্যাটার্জি, আবার খিলখিল হাসির শব্দ। চ্যাটার্জি বুঝতে পারে গন্তব্য ভুলে ক্রমশই সে হাসির শব্দ লক্ষ্য করতে করতে ঝরনাটার দিকে এগিয়ে চলেছে। তবু ফিরে আসতে পারে না।

—উদিকে যাস্ না রে বাবু, চিতা আছে উদিক পানে।

হঠাৎ কানের পাশ দিয়েই যেন বলে যায় মেয়েটা। বলেই আবছায়ায় ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অন্ধকারের দিকে লক্ষ্য করে চ্যাটার্জি বলে, চিতা মারতেই তো এসেছি। বন্দুক আছে হাতে। বলে বন্দুকটা উচিয়ে ধরে। হয়তো বা মেয়েটাকে ভয় দেখাবার জন্যেই।

কিন্তু ভয় কাকে বলে জানে না টিয়ারঙীরা।

তাই হেসে ওঠে মেয়েটা। বলে, চিতা কি গুলি করে মারবার জিনিস রে বাবু।

—নয়? বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করে চ্যাটার্জি।

উত্তর আসে, না রে বাবু, ও হাতে মারবার জিনিস বটে। খুনিয়া দিয়ে মারতে লাগে।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, চিতা মারবি বাবু? চিতা আছে উ দিকে।

মেয়েটির খিলখিল হাসি কি যেন নেশা ধরায় চ্যাটার্জির মনে। কি এক অবোধ্য আকর্ষণ। কিছুতেই যেন ছেড়ে যেতে পারে না, কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না।

চ্যাটার্জি বলে, না রে, চিতা মারতে আসিনি।

—শিকার করবি না তো উ বন্দুকটা কাঁধে লিয়েছিস কেন রে বাবু? বলে আবার হেসে ওঠে মেয়েটা।

তারপর চ্যাটার্জির সামনে এসে দাঁড়ায়।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে চ্যাটার্জি। টিয়ারঙের বুনো মেয়ের শরীরে এমন রূপযৌবন, এমন মোহময় আকর্ষণ!

উদ্‌ভ্রান্ত বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে চ্যাটার্জি ধীরে ধীরে জিগ্যেস করে টিয়ারঙীরা কোথায় জটলা পাকিয়েছে, বনে আগুন দেবে কিনা।

মেয়েটা এগিয়ে আসে প্রশ্ন শুনে।

বলে, হাঁ রে বাবু। ঐ দুশমনগুলা জ্বালায় দিবে বনটা, টিয়ারঙটা জ্বালায় দিবে।

চ্যাটার্জি ফিসফিস করে বলে, ওরা কোথায়? কোনদিকে?

হেসে ওঠে মেয়েটা।—আমায় কি দিবি বল্ আগে। উদের ধরায় দিব তো আমায় কি দিবি বল্ ক্যানে।

চ্যাটার্জি ফিসফিস করে বলে, টাকা দেব। এই নে টাকা—

বলে পকেট থেকে টাকা বের করে এগিয়ে দেয় চ্যাটার্জি।

মেয়েটা তব তুলে নেয় না টাকাটা। দূর থেকে হাত পেতে বলে, দে ছুঁড়ে দে।

টাকাটা ছুঁড়ে দেয় চ্যাটার্জি।

টুপ করে সেটা লুফে নেয় মেয়েটা। তারপর ফিসফিস করেই বলে, আয়, আমার সাথে সাথে আয় রে বাবু।

বলে তরতর করে এগিয়ে চলে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে, আবছা অন্ধকার ঝোপের ভেতর দিয়ে। বনের রাস্তা পার হয়ে সরু ঝরনাটার ধার দিয়ে এক জায়গায় এসে থামল মেয়েটা।

বললে, সিধা চলে যা বাবু। টুকুন গেলেই উদের দেখতে পাবি।

—তুই যাবি না ?

আতঙ্কের ছাপ ফুটল মেয়েটার মুখে চোখে।

বললে, না রে বাবু, টাকা লিয়ে ধরায় দিছি উদের, শুনলে খুনিয়া বসায় দিবে।

চ্যাটার্জি পকেট থেকে আরেকটা টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল আগের মতোই।

আগের মতোই টুপ করে সেটা লুফে নিল মেয়েটা। তারপর দাঁড়িয়ে রইল। ফিসফিস করে বললে, সিধা চলে যারে বাবু।

নির্ভয় নিঃশঙ্ক ভাবে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেল চ্যাটার্জি। আর রুদ্ধনিশ্বাসে যেন অপেক্ষা করে রইল মেয়েটা।

হ্যাঁ, ঠিক পথ ধরেই চলেছে বাবুটা। ঠিক পথ ধরেই।

কয়েক মুহূর্ত শুধু। তারপরই চিৎকার করে উঠল চ্যাটার্জি।

হরিণ ধরবার ফাঁদটা বুঝতে পারেনি চ্যাটার্জি। লতাপাতার ওপর পা ফেলতেই হুড়মুড় করে একেবারে গর্তে পড়ে গেছে সে।

চিৎকার করে উঠল চ্যাটার্জি। আর সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি শুনতে পেল।

হাসির ঝরনা যেন। থামতে চায় না। কৌতুকে লুটিয়ে পড়ে হাসছে একটা বুনো মেয়ে। একটা নৃশংস টিয়ারভীর উন্মাদ হাসি ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

চিৎকার করে চ্যাটার্জি।

গভীর খাদটায় পড়ে গিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু নরম কাদায় পা বসে যায় তার। যত প্রাণপণ চেষ্টা করে ততই কাদায় পা বসে যায়।

করুণ স্বরে চিৎকার করে চ্যাটার্জি।—ওরে বাঁচা, বাঁচা আমাকে।

আর খিলখিল রহস্যময় হাসির প্রতিধ্বনি ভেসে আসে ওপর থেকে।

চ্যাটার্জি চিৎকার করে, তোকে অনেক টাকা দেব, টাকা দেব অনেক, বাঁচা, আমাকে বাঁচা।

আর টিয়ারঙী মেয়েটা উঁকি দিয়ে দেখে ওপর থেকে আর হাসে। হাসি নয়, যেন শানিত একজোড়া ছুরির আওয়াজ।

রহস্যময় মেয়েটার খিলখিল হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। উঁকি মেরে বলে, আমি আকাশী বটি রে বাবু, নাচনী আকাশী বটি।

—বাঁচা আকাশী বাঁচা। চিৎকার করে চ্যাটার্জি।

কৌতুকে হেসে ওঠে আকাশী। বলে, আমার বুড়া বাপটারে, মাধো সর্দারটারে গুলি করেছিলি তুই।

ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে চ্যাটার্জি, অনুনয় করে, ক্ষমা কর্ আকাশী, বাঁচা আমাকে বাঁচা।

কিন্তু সে-অনুনয়ে মন টলে না আকাশীর। খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, আমার বুড়া বাপটা ক্ষমা করবে তরে, যা বুড়া বাপটার কাছে যা।

বলে খিলখিল করে হেসে উঠেই নাচতে নাচতে বস্তির দিকে ছুটে চলে যায় আকাশী। আনন্দে, ফুর্তিতে সমস্ত মন যেন তার পূর্ণিমার চাঁদের মতো ভরে উঠেছে।

নিজের মনেই নাচতে নাচতে বলে, যা আমার বুড়া বাপটার কাছে যা। আর সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। যেন কত বড়ো কৌতুক, কত বড়ো রসিকতা!

কুড়ি

চ্যাটার্জিকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

খুঁজে পাওয়া গেল শুধু বন্দুকটা। হরিণ ধরবার ফাঁদটার ওপর বন্দুকটা কুড়িয়ে পেল পাঠক। চ্যাটার্জির সমস্ত শরীরটা তখন চোরা-কাদায় ডুবে গেছে।

কান্নার রোল উঠল বাবুবাংলোয়। বিস্মিত হল সকলেই। এভাবে পথ ভুল করে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হবে চ্যাটার্জিকে, কেউ কল্পনাও করেনি। তাই কেউ বুঝতে পারল না, নাচনী মেয়েটা পাগলের মতো খিলখিল করে হেসে উঠছে কেন নিজের মনেই।

হ্যাঁ, ধরা পড়েছে আকাশী, নিজেই এসে ধরা দিয়েছে সে। কিন্তু পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা। উন্মাদ হয়ে গেছে। কেন যে হঠাৎ নিজের মনেই খিলখিল করে হেসে ওঠে সে কেউ বুঝতে পারে না।

টিয়ারঙীরাও বুঝতে পারে না, কি হল চ্যাটার্জির !

তাই সবচেয়ে বিস্মিত হল টিয়ারঙীরাই। খবর শুনেই ছুটে এল তারা কোম্পানিমহলে। চ্যাটার্জির বাংলোর সামনে।

ফিরুজাও ছুটে এল। তাপুদিদির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে কাঁদল সেও। তাপসীকে বার বার বোঝাতে চাইলে, টিয়ারঙীরা খুন করেনি চ্যাটার্জিকে ; টিয়ারঙীরা জানে না চ্যাটার্জি কোথায়। কেউ বললে, অন্ধকারে হয়তো পা পিছলে খালের জলে ভেসে গেছে। কেউ বললে, চিতা বাঘে তাকে টেনে নিয়ে গেছে গভীর জঙ্গলের ভেতর।

চ্যাটার্জির রহস্যময় মৃত্যুর খবর শুনে সব বিদ্বেষ যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল টিয়ারঙীদের মন থেকে।

যাই ঘটে থাক, সবচেয়ে বড়ো সত্য হল চ্যাটার্জি বেঁচে নেই।

সমস্ত কোম্পানিমহল যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে এ-খবর শুনে। বিষণ্ণ করুণ একটা স্তব্ধতা ঘিরে আছে চতুর্দিক।

শুধু চ্যাটার্জির মৃত্যুই নয়, বিষণ্ণ হবার মতো আরেকটি পরোয়ানা এসে পৌঁছেছে টিয়ারঙে।

জাহাজ এসে পৌঁছবে দু-একদিনের মধ্যেই। সরকারী নির্দেশ এসেছে টিয়ারঙ ছেড়ে 'মাটি'তে চলে যেতে হবে সকলকে। টিয়ারঙীরাও থাকতে পাবে না।

বসে বসে চোখের জল ফেলবার সময় নেই আর। চিন্তা করবার সময় নেই। কোম্পানিমহলের সকলেই উঠে পড়ে লেগেছে জিনিস-পত্তর গোছগাছ করতে। জাহাজ এসে পৌঁছলে আর সময় পাবে না তারা।

হঠাৎ একটা বিচিত্র শব্দ শুনে ছুটে এল টিয়ারঙীরা, কোম্পানি-মহলের কুলিকামিনরা।

উড়োজাহাজ, উড়োজাহাজ!

সমুদ্রের জাহাজ নয়, আকাশের জাহাজ। এক ঝাঁক প্লেন উড়ে চলে গেল টিয়ারঙের ওপর দিয়ে। ভয়ে, বিস্ময়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সকলে।

এই উড়োজাহাজ নাকি বোমা ফেলে যায়, বোমার আগুনে ধ্বংস করে যায় সব কিছু।

কোম্পানির লোকদের ওপর টিয়ারঙীদের যেটুকু আক্রোশ চ্যাটার্জির মৃত্যুতে তা মুছে গিয়েছিল। বোমার ভয়ে এক হয়ে গেল সকলেই।

উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় সকলেই একে একে এসে জড়ো হল জাহাজ-

ঘাটার সামনে, সমুদ্রের তীরে।

শুধু ফিরুজা চলে গেল টিয়ারঙীদের সকলকে খবর দিতে।

বুমা, বুমা। এক কথা টিয়ারঙীদের মুখে মুখে। আকাশে ভাসতে ভাসতে তাদের মাথার ওপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজ যেতে দেখেছে তারা। কি ভীষণ গর্জন তার। বাজ পড়বার পূর্বমুহূর্তে যেমন মেঘের আওয়াজ হয়, এও যেন তেমনি। বোমা পড়বার আগে উড়োজাহাজের গর্জন।

গঞ্জমাঝিদের কাছে বোমার গল্প শুনেছে টিয়ারঙীরা। সে-আগুনে নাকি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় সব কিছু।

সুতরাং পালাতে হবে, টিয়ারঙ ছেড়ে পালাতে হবে তাদের।

জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে শুরু করে টিয়ারঙীরাও।

জাহাজ আসছে, জাহাজ এসে পৌঁছবে দু-একদিনের মধ্যেই।

কোলের বাচ্চাটাকে, বান্নুকে ঝুলায় শুইয়ে রেখে ঘরে ঘরে খবর জানিয়ে আসতে ছুটল ফিরুজা। সব প্রথমে মনে পড়ল যম্‌নীর বুড়ো বাপ আর তার ছেলে বুধাকে। বুড়োটা আধ-কানা, চোখে দেখতে পায় না। তার ওপর হাঁটতে পারে না সোজা হয়ে। আর বুড়া অন্ধ তো বুধাও অন্ধ। ছায়ার মতো বুড়োর পিছনে পিছনে ঘোরে সে, বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে জায়গা করে নিতে পারবে না।

যেতে যেতে আরো সকলকে তৈরি হতে বলে দিল ফিরুজা। তৈরি তারা হয়েই আছে। খবর তারাও শুনেছে।

এদিকে ঝড় উঠছে। ঝড় শুরু হবে মনে হচ্ছে। সনসন সনসন পাতা নড়তে শুরু হয়েছে গাছের।

সমস্ত পাড়াটা ঘুরে যম্‌নীর বুড়ো বাপ আর বুধাকে তৈরি হতে

বলে ফিরে এল ফিরুজা।

ফিরে এসে দেখলে চিৎকার করে কাঁদছে বাচ্চাটা।

মদ্‌না চাটাই পেতে শুয়ে ছিল। কান্না শুনে, আর নয়তো ফিরুজাব চিৎকারে সেও ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ছুটে গেল বান্নুর কাছে।

একটা ভয়ঙ্কর মাকড়সা। ঝুলার দড়ি বেয়ে বেয়ে একটা মাকড়সা নেমে এসে কামড় বসিয়েছে বান্নুর হাতে। এক ফোঁটা লাল রক্ত জমে আছে সেখানটায়। প্রবালের তাবিজের মতো।

মদ্‌না একমুহূর্ত থমকে চেয়ে রইল কালো মাকড়সাটার দিকে। তারপর অদ্ভুত এক নৃশংস দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে। নাকটা ফুলে উঠল।

ধীরে ধীরে ডানহাতের দুটো শক্ত আঙুল এগিয়ে গেল মাকড়সাটার দিকে। ইস্পাতের মতো শক্ত আঙুল দুটো চেপে ধরল সেটাকে, হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে পিষে দিল। তারপর দেয়ালে সেটাকে থেঁতলে দিল মদ্‌না। তাতেও যেন শান্তি পেল না। থেঁত্‌লে থেঁত্‌লে শেষে যখন দেয়ালের গায়ে শুধু কয়েকটা কালো কালো জলো দাগ ছাড়া আর কিছু রইল না তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

ততক্ষণে কি সব লতাপাতা এনে ঘষে ঘষে বান্নুর হাতে লাগাতে শুরু করেছে ফিরুজা। আর মাকড়সাটার নামে গাল পাড়ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কান্না থামল বান্নুর। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল ফিরুজা আর মদ্‌না। বাইরে তাকিয়ে দেখল।

তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে বাইরে। ঝড় উঠেছে।

এমন ঝড় বুঝি বহুকাল দেখেনি তারা। প্রলয় কাণ্ড। মাঝে

মাঝে বিকট আওয়াজ আসছে। শিকড় সমেত গাছ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। ঘরের চালাটা যে কোনো মুহূর্তে যেন উড়ে চলে যাবে। ঝমঝম ঝমঝম একটানা একটা বিশ্রী শব্দ।

ধুলো আর শুকনো পাতার ঘূর্ণিতে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

সাবধানী ঘন্টি ভেসে আসছে সমুদ্রপাড় থেকে।

সাবধানী ঘন্টি? না। কান পেতে শুনল ফিরুজা। এ-আওয়াজ সাবধানী ঘন্টির নয়। এ-আওয়াজ জাহাজ এসে পৌছনোর।

এ-শব্দ বহুবার শুনেছে ফিরুজা। সেই পরিচিত ধ্বনি। এই ঘন্টির অপেক্ষাতেই বসে আছে তারা। এ-শব্দ শুনতে পেলেই ছুটে যেতে হবে সমুদ্রপাড়ে।

ফিরুজা আর মদ্‌না পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। যেন কি করবে ঠিক করতে পারছে না। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। আর দূর থেকে ভেসে আসা অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি।

বাঁশের ছোট্ট হাত-তাঁতখানা তুলে নিল মদ্‌না, জালটা কাঁধে ফেলল। বাসনকোসন যা পারল পিঠে নিয়ে বললে, আমি ঘাটাকে চললাম, আয় তু।

ফিরুজা তাকাল একবার মদ্‌নার মুখের দিকে। বললে, তুই চ মাদোন, আমি বুড়াটারে নিয়া যাবো, বুধাকে নিয়া যাবো।

মদ্‌না ছুটে চলে গেল ঝড়ের মধ্যে। সেদিকে তাকিয়ে রইল ফিরুজা কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে এসে বাচ্চার দিকে তাকালে। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্বালা ঠাণ্ডা হয়েছে তার।

বান্নুর মুখে ঠোঁট ছুঁইয়ে নিজের মনেই হাসল ফিরুজা। তারপর ঝড়ের মধ্যে সেও ছুটে বেরিয়ে গেল। বুড়া আর বুধাকে সঙ্গে নিয়ে

ফিরে এসে বান্নুকে কোলে নিয়ে জাহাজঘাটায় চলে যেতে হবে। সময় নেই আর।

জাহাজঘাটার ঘন্টি বেজে চলেছে একটানা কান্নার মতো।

ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ে ফিরুজা। কোনোরকমে সামলে নিয়ে আবার ছুটতে শুরু করে। বিকট আওয়াজ করে গাছ ভেঙে পড়ে, গাছের শাখা ভেঙে পড়ে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ফিরুজা। এঃ একটা পাখির বাসা একেবারে থেঁত্‌লে গেছে। একটা বাচ্চা কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেছে। ঝড়ের দাপটে বেশিক্ষণ হয়তো বাঁচবে না। সযত্নে সেটাকে দু-হাতে তুলে নেয় ফিরুজা, তারপর আবার ছুটতে শুরু করে।

এদিকে টিয়ারঙীর দল কাঁধে মালপত্র নিয়ে ছুটছে জাহাজঘাটার দিকে। সকলের মুখেচোখেই আতঙ্ক।

ছুটতে ছুটতে এসে বুড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে ফিরুজা। —বুধা, বুধা!

কিন্তু কোনো উত্তর আসে না।

তবে! ঘরের ঝাঁপিতে ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে যায়। উঠনের চারপাশ, ঘরের ভেতর সর্বত্র উঁকি দিয়ে দেখে। না, কোথাও নেই। না বুড়া, না বুধা।

ঝাঁপি খুলে রেখেই টিয়ারঙীর দলটা যেদিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল সেইদিকে পা বাড়ায় ফিরুজা।

· পথে যার সঙ্গেই দেখা হয় জিগ্যেস করে।—বুড়াকে দেখেছিস, যমুনীর বাপটারে দেখেছিস। আমার বুধা বেটাটারে দেখেছিস?

না, কেউ দেখেনি।

সকলের সঙ্গে ফিরুজাও জাহাজঘাটার দিকে ছুটতে শুরু করে।

সমুদ্রের পাড়ে এসে দেখে সমস্ত টিয়ারঙও যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। কোম্পানিমহলের কুলিকামিন, বাবুবাংলোর লোক, আর টিয়ারঙীর দল। সকলেই পালিয়ে যাবার জন্যে উন্মুখ। সকলের মুখেচোখেই আতঙ্ক।

এদিকে থেকে থেকে ঝড়ের দাপট। বালির ঘূর্ণি ওড়ে। একটানা ঝড়ের আওয়াজ আর তালে তালে ফেটে পড়ে সমুদ্রের সফেন তরঙ্গ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে যেন সন্তান শোকাহত মায়ের মতো। ঢেউয়ের গর্জন বেড়ে ওঠে।

ওদিকে দূরে, সমুদ্রের বুকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে জাহাজখানা।

উন্মুখ হয়ে আছে সকলেই। জাহাজ এসে পৌছলেই ছুটে গিয়ে উঠতে চায়। তাই সবচেয়ে বেশি ভিড় গ্যাংওয়ের সামনে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে ছুটে বেড়ায় ফিরুজা। আর চিৎকার করে বুধার নাম ধরে। যাকে পায় তাকেই প্রশ্ন করে, বুধাকে দেখেছিস্ তুরা ? বুড়াকে দেখেছিস্ ?

না, কেউ দেখেনি।

এক পাড় থেকে আরেক পাড়ে বুধাকে খুঁজে বেড়ায় ফিরুজা।

ঝড়ের দাপট বাড়তে থাকে। গুজব রটে যায় টিয়ারঙীদের মধ্যে, এ-ঝড়ে নাকি সমুদ্রে ডুবে যাবে সারা টিয়ারঙ।

সত্যিই বুঝি তাই এমন উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্রের ঢেউ। ঘুমুঙ্গি ঘরের জাল উড়ে যায়। ডিঙিগুলো বালির ওপর ডিগবাজি খেতে খেতে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর গিয়ে পড়ে। সেদিকে কেউ আর দৃষ্টি দেয় না। জিনিসপত্তরের চেয়ে নিজের জীবনের ওপরই দৃষ্টি

সকলের। বাঁচতে হবে, কোনোরকমে বাঁচতে হবে এই ঝড় থেকে, বোমা থেকে। টিয়ারঙ ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই পালাতে হবে টিয়ারঙ ছেড়ে।

পাগলের মতো ছুটে বেড়ায় ফিরুজা, এদিক থেকে ওদিক। আর থেকে থেকে চিৎকার করে, বুধা! বুধা!

কেউ সাড়া দেয় না।

হঠাৎ এক ফাঁকে দেখা হয়ে যায় মদ্‌নার সঙ্গে।—বুধাকে দেখেছিস্ মাদোন?

না, মদ্‌নাও দেখেনি।

দুজনে দুদিকে খুঁজতে শুরু করে। এত লোকের মধ্যে কোথায় খুঁজে পাবে বুধাকে।

মন্‌নীর বুড়া বাপটাকে কথা দিয়েছে ফিরুজা। বলেছে, বুড়াও আমার, বেটাও আমার। আজ এ-মুহূর্তে তাদের ছেড়ে পালাবে কি করে সে?

এদিকে বেলা পড়ে আসে। ঝড় বাড়ে। সমস্ত সমুদ্র যেন ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ফুলে ফেঁপে উঠছে। ঢেউ নয়, যেন সাপের ফণা। ঝড় নয়, যেন বিষাক্ত নিশ্বাস। মাঝে মাঝে ঝড়ের দাপটে বালির রাশি উড়ে যায় উড়ন্ত চাদরের মতো। টলে টলে এ ওর ঘাড়ে পড়ে। কোনোরকমে জিনিসপত্তর সামলায়। পায়ের টাল সামলায়।

জাহাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর অধৈর্য হয়ে ওঠে সকলে। ফিরে ফিরে আকাশের দিকে তাকায়। ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দের ফাঁকে আরো কি এক বিচিত্র আওয়াজ শোনা যায় কিনা এই আতঙ্কে কান পেতে থাকে।

উন্মুখ আগ্রহে জাহাজঘাটার দিকে তাকিয়ে থাকে সকলে।

আসছে, ক্রমে ক্রমে জাহাজ ভিড়ছে সমুদ্রতীরে। উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে সকলে। একসঙ্গে গ্যাংওয়ের দিকে ছুটে যেতে চায় সকলে। প্রত্যেকটি মানুষ যেন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। নিজের জীবন বাঁচাবার আগ্রহটাই যেন সবচেয়ে বড়ো। তারপর আপনজন। জোয়ান পুরুষগুলো বুড়ো-বাচ্চাদের ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। কনুইয়ের গুঁতোয় সরিয়ে দেয় মেয়েদের।

ফিরুজা তখনো উন্মাদের মতো ছুটে বেড়ায়। চিৎকার করে ডাকে, বুধা, বুধা!

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পিছন থেকে মদনার ডাক ভেসে আসে।—ফিরুজা, ফিরুজা!

থমকে ফিরে দাঁড়ায় ফিরুজা।

মিলেছে, বুধাও মিলেছে, বুড়াও মিলেছে!

আনন্দে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ফিরুজার। হাসিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে মুখখানা।

মদনার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে যমুনীর বুড়া বাপ, আর তার বুধা বেটা।

ছুটে এসে বুধাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফিরুজা। আনন্দে, হাসিতে এক অপূর্ব অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তার মুখেচোখে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই। উপায় নেই দাঁড়িয়ে থাকার।

পিছন থেকে আতঙ্কিত মানুষের ভিড় তাদের ঠেলে নিয়ে চলে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় সকলে। আপনা থেকেই কখন যেন ভিড়ের চাপে গ্যাংওয়ের পথ ধরে জাহাজের ওপর উঠে আসে।

পরম নিশ্চিন্ত ফিরুজার কপাল বেয়ে ক্লান্তির ঘাম ঝরে পড়ে।

জাহাজের ডেকের রেলিং ধরে ফেলে-আসা টিয়ারও দ্বীপের দিকে তাকায়। পরম আনন্দে, উন্মাদ বেদনার শেষে সদ্যোজাত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে যে-সুখ, ফিরুজার ব্যথিত বুকেও তেমনি আনন্দ উঁকি দেয়। তারপর চেতনা ফিরে আসে। অনুভবে বুঝতে পারে জাহাজ পাড়ি দিতে শুরু করেছে সমুদ্রের বুকে।

তারপর? তারপর হঠাং মনে পড়ে যায় বান্নুকে, তার ছোট্ট মেয়েকে। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে ফিরুজা।—বান্নু, বান্নু!

এতক্ষণ যেন নেশার ঘোরে কেটে গেছে তার।

কোলের বাচ্চাটার কথা মনে পড়তেই আতঙ্কে অনুশোচনায় বিকট স্বরে চিংকার করে উঠল ফিরুজা।

মদনার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গেল, বের হল না কথাটা। শুধু অস্ফুট একটা শব্দ যেন গলার স্বরেই থমকে গেল।

বান্নু! বান্নুকে সেই ছোট ঘরের ঝুলায় ফেলে এসেছে ফিরুজা। বুধাকে খুঁজতে গিয়ে বান্নুর কথা ভুলে গেছে।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে তখন, গতিবেগ বাড়তে শুরু করেছে। আর চতুর্দিকে ভিড়, ডেকে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। কাকে জাহাজ থামাতে বলবে সে, থামবে কেন জাহাজ? কি করবে ফিরুজা, কি করা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারে না।

মুহূর্ত মাত্র। মুহূর্তের জন্যে মদনার মুখের দিকে দুর্বোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেই ছেড়ে আসা টিয়ারও দ্বীপের দিকে উদাস দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল সে।

তারপর হঠাৎ ডেকের ওপর থেকে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

টিয়ারঙীরা চিৎকার করে উঠল, মদ্‌না চিৎকার করে উঠল। বোধ হয় ফিরুজার পিছনে পিছনে মদ্‌নাও ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, কিন্তু পারল না। টিয়ারঙীর দল ধরে রইল তাকে। জাহাজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, আর কি সমুদ্রের বুকে খুঁজে পাবে সে ফিরুজাকে! এই প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝে, এই ক্রুদ্ধ উন্মত্ত ঢেউয়ের তালে তালে ফিরুজা কোথায় ভেসে গেছে, খুঁজে পাবে কি কবে মদ্‌না।

জলের মানুষ আমরা, জল আমাদের চিনে। সত্যিই বুঝি তাই। দ্বীপের মানুষ ফিরুজা, সমুদ্র তাকে চেনে। ঝড় আর উত্তাল তরঙ্গ, সব কিছু উপেক্ষা করে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলে ফিরুজা।

এক একবার মাথা তুলে তাকায় দূরের দ্বীপটার দিকে, আর প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার কেটে এগিয়ে চলে দ্বীপের দিকে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে তীরে এসে পৌঁছয় ফিরুজা। কিন্তু ক্লান্তির সময় নেই এখন, বিশ্রামের সময় নেই। মাটি ছুঁয়েই তৃপ্তির উল্লাস দেখা দেয় তার মুখে চোখে। পরমুহূর্তেই ছুটতে শুরু করে ফিরুজা, টিয়ারভীদের বস্তির দিকে, তার ফেলে আসা ডেরার দিকে। খাল পার হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছয় ফিরুজা তার ডেরার দরজায়।

চিৎকার করে ডেকে ওঠে।

কিন্তু ঝুলাটার কাছে ছুটে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। একটা ভাম কুৎসিত শব্দ করে রক্তাক্ত জিভ চাটতে চাটতে লাফিয়ে পালায় ফিরুজার ডাক শুনে। উৎকণ্ঠায় বুক কেঁপে ওঠে ফিরুজার। ঝুলাটার কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ফিরুজা। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

দুর্বোধ দৃষ্টিতে ঝুলাটার দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখ মেলে। চোখের জল যেন শুকিয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস যেন থমকে থেমে আছে বুকের মধ্যে।

দুটি নরম হাতে শিশুর রক্তাক্ত শরীর তুলে নিল সে সযত্নে,

সস্নেহে। যেন এখনো বেঁচে আছে সে, যেন এখনই আবার আগের মতো হেসে উঠবে খিলখিল করে।

অনিমেষ চোখে কোলের শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই অজান্তে কখন যেন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল ফিরুজা।

ঝড় থেমে গেছে তখন।

তার মনের ঝড়ও বুঝি থেমে গেছে।

ধীর পায়ে এগিয়ে চলে ফিরুজা। উদাস বিষণ্ণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে সামনের দিকে। যন্ত্রচালিতের মতো পা এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে।

সেই আঁকাবাঁকা বনপথ। কাঁটাঝোপ। বিশাল তরুরাজির রহস্যময় চন্দ্রালোকিত ছায়া। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যাঘন অন্ধকারে ঈষৎ আলোক।

রহস্যময়ী বনদেবীর মতো, হৃতসন্তান উন্মাদিনীর দুটি বড়ো বড়ো নীল চোখ যেন অর্থহীন বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে অনিমেষ দৃষ্টিতে।

বনের পথ পার হয়ে, খাল পার হয়ে, কোম্পানিমহলের পরিত্যক্ত নির্জন ঘরের সারি, নিস্তব্ধ ঘুমুঙ্গি ঘর পার হয়ে সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ায় ফিরুজা।

ঝড় থেমে গেছে তখন। বনের গাছে গাছে স্তব্ধতা। একটি পাতাও যেন নড়ে না, যেন বনের হৃদয়েও থমকে আছে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস।

সমুদ্র শান্ত। নেই সেই উত্তাল তরঙ্গ। নেই সেই উন্মাদ আলোড়ন।

ডিঙি নেই সমুদ্রের বুকে, জাহাজ নেই।

যতদূর চোখ যায়, নিঃসীম নীলের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের বুকে শুধু শান্ত অবনত বিষণ্ন করুণ ঢেউ, আর শাদা শাদা ফেনার অশ্রু।

যতদূর চোখ যায়, তাকিয়ে থাকে ফিরুজা। দুটি হাতে মৃত শিশুর রক্তাক্ত শরীর, দুটি চোখে গভীর হতাশা।

একটিও ডিঙি নেই সমুদ্রের বুকে, জাহাজ নেই।

নির্জন দ্বীপের তীরে দাঁড়িয়ে, অসীম রহস্যের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সশব্দে কেঁদে ওঠে ফিরুজা।

উদাস বিষণ্ন দৃষ্টি ধীরে ধীরে নৃশংস হয়ে ওঠে। মৃত সন্তানের মা নয়, উচ্ছল রঙ্গময়ী নারী নয়, হিংস্র একটা পশু জেগে ওঠে ফিরুজার রক্তে।

ফিরে আসে ফিরুজা। তেমনি মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে আসে। তেমনি সযত্নে সস্নেহে ঝুলার শয্যায় শুইয়ে দেয় সে তাকে।

তারপর খোঁপা থেকে খুনিয়া খুলে নিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করে।

রক্তের স্বাদ পেয়েছে বন্য ভাম। রক্তের গন্ধে আবার ফিরে আসবে নিশ্চয়। প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকে ফিরুজা।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পার হয়ে যায়।

একা। ফিরুজা একেবারে একা এই নির্জন দ্বীপের বুকে। সৃষ্টির প্রথম যুগের সেই আদিম অরণ্য যেন। সমস্ত দ্বীপের সম্রাজ্ঞী হয়েও তার চেয়ে নিঃস্ব কেউ নেই। আইনের বাধা নেই, নিষেধ নেই সমাজের। লজ্জা নেই, গর্ব নেই। আনন্দ নেই, দুঃখ নেই। শুধু

প্রাণধারণের মুক্তি।

বিশাল সমুদ্রের বুকে হৃদয়ের মতো ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ। ফিরুজার একক জীবনের চোখে এই ছোট দ্বীপ টিয়ারঙও যেন বিশাল সমুদ্র।

বন্য হরিণীর মতো এখানে-ওখানে ছুটে বেড়ায় ফিরুজা, কখনো থমকে দাঁড়ায় সমুদ্রের তীরে। উদাস দুটি চোখ মেলে তাকায়। কখনো আকাশের দিকে।

বন্য হরিণীর মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেদিনও সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়াল ফিরুজা।

উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে রইল দূরের দিগন্তের দিকে। নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ দিকচক্রবালে যে-রেখাটিতে মিশে গেছে সেই দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল অনিমেষ দৃষ্টিতে।

এমনি করেই তার হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছিল ফিরুজা। তারপর একদিন ফিরে এল সেই মানুষটাই, মোহ ভেঙে গেল তার।

আজ আবার মদনার কথা ভেবে ভেবে দু-চোখে স্মৃতির অশ্রু নামে। আজ আবার তেমনি উদাস চোখ মেলে তাকায় ফিরুজা।

ভাবে, একদিন সেই মদনা বুঝি আবার ফিরে আসবে! বুঝি আবার টিয়ারঙ জেগে উঠবে আগের মতোই।

তাই আশায় আশায় প্রতিদিনের মতোই ছুটে এসে দাঁড়াল সে সমুদ্রের তীরে। তাকিয়ে রইল দু-চোখ মেলে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক অসীম স্ফূর্তির কাঁপনে অধীর হয়ে উঠল ফিরুজা। নিজেরই অজান্তে সমুদ্রের জল ছুঁয়ে এগিয়ে গেল কয়েক পা।

আরো স্পষ্ট চোখে তাকাল।

হ্যাঁ, ধোঁয়া। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে দূরে কোথায়, সমুদ্রের বুকে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল ফিরুজা। মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কাছে এগিয়ে আসছে যেন।

ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ে ফিরুজার পায়ে। সময় কেটে চলে।

অনেক দূরে, অস্পষ্ট রেখার মতো ফুটে ওঠে কি যেন।

জাহাজ! সমুদ্র-জাহাজ!

হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার করে ডাকে ফিরুজা। আসছে, টিয়া-রঙের জাহাজ বুঝি ফিরে আসছে। মদনা ফিরে আসছে।

আনন্দ-হাস্যে মুখর মুখখানা তার ধীরে ধীরে বিষণ্ন হয়ে ওঠে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমুদ্র-জাহাজ, তারপর ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে যায় দূরে, দিকচক্রবালে।

ফিরুজার গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতো মিলিয়ে যায় জাহাজখানা।

টিয়ারঙের জাহাজ নয়। হয়তো বা অন্য কোনো দ্বীপগামী, হয়তো বা অন্য কোনো গন্তব্যের জাহাজ আশার ইশারা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

নির্জন রাত্রির মতো ক্লান্তি নেমে আসে। নিঃসঙ্গ পৃথিবীর মতো।

এ এক অসহ্য জীবন। কথা বলার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে ফিরুজা। চিৎকার করে আপন মনেই এক একসময় অর্থহীন কিছু একটা বলে উঠেও অসীম আনন্দ পায়। কখনো নিজের মনেই প্রলাপের মতো কত কিছু বলে যায়।

হঠাৎ কোনো শব্দ শুনে ছুটে আসে সমুদ্রের দিকে। দূরের

জাহাজ দেখে আবার উল্লাসে অধীর হয়ে ওঠে। অপেক্ষা করে, তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তারপর একসময় জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়।

কেউ জানে না, হয়তো বা ভুলে গেছে ফিরুজার কথা। হয়তো বা ভুলে গেছে এই নির্জন পরিত্যক্ত টিয়ারঙের কথা।

বনপথে যেতে যেতে কখনো অর্থহীনভাবে চিৎকার করে ওঠে ফিরুজা। কখনো জাহাজঘাটার সাবধানী ঘন্টিটা বাজিয়ে চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর সেই শব্দের আনন্দে নেচে ওঠে।

জনশূন্য টিয়ারঙ দ্বীপে যেন এক বন্দিনী মুক্তি পাবার আশায় ছুটে বেড়ায়। সমুদ্রের বুকে ভেসে যেতে চায়।

কোনো কোনোদিন ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যতদূর চোখ যায়। তারপর ক্লান্ত অবসন্ন শরীর আর হতাশায় ফিরে আসে। অবসাদ আর ঘুম নেমে আসে।

সমুদ্রে বুঝি অনেক শান্তি। সমুদ্রে আছে স্বাধীনতা।

মানুষের জীবনও হয়তো এমনই সমুদ্র আর দ্বীপে আনাগোনা। মুক্তির আনন্দে হাঁপিয়ে ওঠে মানুষ। বিশাল জনতার ভেতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়ে নিতে চায়। মুক্তি থেকে ফিরে পেতে চায় অসীম বন্ধন। তারপর একদিন সেই দ্বীপ মনে হয় অসহ্য জীবন। ঘরের প্রাচীর ভেঙে সমুদ্রের, জীবনের মুক্তি পেতে চায়।

শুধু এই আনাগোনা, দ্বীপ থেকে সমুদ্রে, আর সমুদ্র ছেড়ে দ্বীপে ফিরে আসা।

ছোট্ট এই টিয়ারঙ দ্বীপ। কেউ আসে সম্পদের লোভে, কেউ পথ ভুলে, কেউ শুধু সুখশান্তির প্রেমময় নীড় খুঁজে খুঁজে। তারপর একদিন ফিরে যেতে হয়, সমুদ্রের ডাকে। ভুল পথ ভুলে গিয়ে,

স্বপ্ননীড় ভেঙে দিয়ে, আরো কিছু সম্পদের লোভে।

যে-লোভে দ্বীপের মানুষ সমুদ্রে ছুটে যায় সেই লোভেই সাগর থেকে দ্বীপে আসে বাবুদের দল। সমুদ্র থেকে এসেছিল আল্‌ভা, নীড় বাঁধতে চেয়েছিল আকাশীকে ঘিরে। আর দ্বীপ থেকে সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল যম্‌নী, গঞ্জের নাচনীর যৌবনের মোহে। দুজনের মোহই ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সেই পুরনো দিনের জীবনে আর ফিরে যেতে পারেনি তারা।

বাইশ

অতশত গুনতে জানে না মদ্‌না। কখনো মনে হয় আট বছর, কখনো দশ। কত কি ঘটে গেছে এতগুলো বছরে। কত কি ভুলে গেছে সে। ভোলেনি শুধু ফিরুজাকে। সেদিনের দৃশ্যটা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। দেখেছে, বান্নু, বান্নু বলে চিৎকার করে উঠল যেন ফিরুজা, আতঙ্কের চোখে এদিক-ওদিক তাকাল, একবার মদ্‌নারই মুখের দিকে, তারপর জাহাজের রেলিং থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে।

জাহাজের ধাক্কা খেয়ে ঢেউ উঠল, সমুদ্রেব ঢেউয়ের পিঠে ফেটে পড়ে নীল জল ঘোলা হয়ে গেল মুহূর্তে।

উৎকণ্ঠায় অনুসন্ধানী চোখে তন্ন তন্ন করে খুঁজল সে ফিরুজাকে। জলের মধ্যে কোথাও ফিরুজার মাথাটা ভেসে ওঠে কিনা দেখবার জন্যে।

ঠিক মনে পড়ে না মদ্‌নার। সংবিৎ ছিল না বোধহয় সে-সময়। শুধু মনে পড়ে সেও লাফ দিয়ে পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু আশপাশের লোকগুলো লাফ দিতে দেয়নি তাকে।

দলের সঙ্গে, স্টিফেন্স কোম্পানির লোকজনের সঙ্গে জাহাজে করেই চলে এসেছিল সে মাতলার আপিসে। যুদ্ধ যত এগিয়ে এল, সরে সরে এসে কোম্পানির দপ্তর কায়েম হল ভেঁড়াহাটে। কিন্তু সেখানে জায়গা হল না টিয়াবন্তীদের। একে একে সবাইকে বিদেয় করে দিল কোম্পানি।

মদ্‌নার মতোই সব টিয়ারন্তীদের চোখে তখন অন্ধকার। কাজ কোথায়, খাবে কি ?

লড়াই আর লড়াই। লড়াইয়ের গল্প তখন চারদিকে।

যে যেদিকে পারল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। বুধাকে নিয়ে শহরের দিকে চলে গেল যমুনার বুড়ো বাপ। আর আকাশী তখন একেবারে পাগল। ভাসা ভাসা চোখ মেলে তাকায়, প্রলাপ বকে, আর মাঝে মাঝে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

প্রথম প্রথম কুলিমজুরের দলের কেউ কেউ ডেকে নিয়ে যেত আকাশীকে, খেতে দিত। কেন তা অবশ্য বুঝত মদনা। তবু বাধা দিতে পারত না।

শেষে কেউ আর ভিক্ষেও দিত না। তখন একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে, ডাকলে ছুটে গিয়ে আঁচড়ে কামড়ে একশা করত।

তারপর কি যে হল আকাশীর, জানেও না সে। বোধহয় চলেই গেল কোথাও। কোথায় কে জানে।

মদনা কিন্তু মাতলার পাড় ছাড়ে না। জেলের দলে গিয়ে ঢুকল প্রথমটা। সমুদ্রে মাছ ধরত যে সে কি আর নদীতে মাছ ধরতে পারবে না? না, সেখানেও সুবিধে হল না। নদীতে মাছ ধরার বিদ্যে শিখতে হয়। মৌসুম জানতে হয়, জানতে হয় জলের নাড়ী-নক্ষত্র।

তাও হয়তো দুদিনেই শিখে নিতে পারত সে। কিন্তু না আছে জাল, না নৌকো। জাল নেই, ডিঙি নেই, সে আবার জেলে কিসে। জমি নেই যার সে কি চাষী হয়, সে শুধু চাষা।

তাই জন খাটতে শুরু করল মদনা। তবু মাতলার পাড় ছাড়তে মন চায় না। কাজ পেলেও নয়, মজুরি পেলেও নয়।

ভেতরে ভেতরে ইচ্ছে, যদি একটা ডিঙি পায় জলে ভাসিয়ে একা

একাই চলে যাবে টিয়ারঙে।

বড়ো বড়ো নৌকোর সাঁইদারদের বলে, টিয়ারঙে চলো, মাছ গিসগিস করছে জলে।

শুনে হাসে তারা।—মিঠে জলের মাছমারা আমরা, নোনাজলের খবর কি জানি!

—পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবো আমি। বলে মদনা।

সাঁইদার হাসে।—রাক্ষসে মাছ আছে সাগরে, দখিন রায় আছে সোঁদরবনে, রূপসী সব ডাইনী আছে দ্বীপগুলোয়।

তা ছাড়া আছে জলপুলিশের নৌকো। যেতেই যদি দেবে তো ভাগিয়ে আনল কেন দ্বীপের লোকগুলোকে।

উপায় নেই বলেই আজ এ-দলে কাল ও-দলে ঘুরে বেড়ায় মদনা। যদি কেউ রাজী হয়। যদি নৌকো ধার পায়।

কিন্তু কে দেবে নৌকো। জেলের নৌকো হল বউয়ের গায়ের গয়না। জমি নেই, গয়না নেই, নেই কিছুই। তবু এই নৌকো আর জালই অনেক। এ-দুটো থাকলে আর পেটের চিন্তা করতে হয় না।

মদনার তাও নেই। ছিল সবই, সবই ফেলে এসেছে। এমন কি ফিরুজাকেও।

বছর কয়েক এমনি করেই কাটল।

শুধু লড়াই থেমে গেছে এ-খবর শুনে ছুটে এসেছিল সে স্টিফেন্স কোম্পানির দপ্তরে। কিন্তু ফিরে গিয়েছিল ব্যর্থ মন নিয়ে। পাঠক বলেছিল, টিয়ারঙে কোম্পানি ফিরে যাবে কিনা ঠিক নেই।

শেষে কাজ নিল জাহাজে। খালাসীর কাজ। মাসে মাসে

মাইনে, তার চেয়ে বড়ো লোভ, জাহাজ সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়।

অন্ধকার রাতে জাহাজ চলে সমুদ্রের ওপর দিয়ে। হঠাৎ হয়তো দূরে এক টুকরো আলো দেখা যায়। আর চঞ্চল হয়ে ওঠে মদনা। খালাসিদের জিগ্যেস করে, কোন জায়গা, কিসের মোহনা। টিয়ারঙ নয় তো!

দিনের বেলায় কাজের ফাঁকে বার বার রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ায়। যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখে, কোথাও এক টুকরো সবুজ দ্বীপ দেখা যায় কিনা। সবুজ তো নয়, শ্যামলা দেখায়।

কিন্তু না, টিয়ারঙ নয়।

এমনি করে কতবার হতাশ হয়েছে মদনা। তবু আশা যায়নি।

আজ এ-জাহাজ। কাল ও জাহাজ। কতবার জাহাজ বদলেছে।

জাহাজের কাপ্তেনকে বলেছে কতবার। তার ফিরুজা পড়ে আছে টিয়ারঙে। শুধু একবার, একটিবার টিয়ারঙে যেতে চায় সে।

শুনে হেসেছে সবাই।

এমনি করেই বছরের পর বছর কেটে গেছে।

কত বছর মদনা নিজেও জানে না। অতশত গুনতে জানে না সে। হিসেব রাখেনি তার।

তবু যখনই জাহাজ ফিরে আসত, দু-দশদিনের ছুটি পেত মদনা, অমনি ছুটে যেত কোম্পানির আপিসে।

মনে আশা, যদি টিয়ারঙে ফিরে যায় কোম্পানির জাহাজ।

এমনিভাবে খোঁজ নিতে এসেই চমকে উঠল মদনা। দপ্তরের সামনে ভিড়। লোক নেওয়া হচ্ছে।

সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো একটা ঘরের সামনে।

জিগ্যেস করল একজনকে। শুনতে না শুনতে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল মদ্‌নার সারা শরীরে।

টিয়ারঙ। টিয়ারঙে চলেছে কোম্পানির জাহাজ। টিয়ারঙের ফেলে আসা কুঠিতে ফিরে চলেছে কোম্পানি।

ঘরটার কাছে ছুটে গেল মদ্‌না। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল।

কিন্তু সামনে গিয়েই সব উৎসাহ চুপসে গেল তার। না, ওভার-সিয়ার পাঠক নয়। অন্য একজন লোক চাকরি বিলিয়ে দিচ্ছে।

একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল মদ্‌না। তারপর হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল লোকটার পায়ের ওপর।—আমি টিয়ারঙী বটি রে বাবু। আমারে লিয়ে চ বাবু।

দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল মদ্‌নার।

তার দিকে কঠিন চোখে তাকাল নতুন ওভারসিয়ার। কি যেন ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে নরম হল তার চোখ।

—কি নাম তোর?

—মদ্‌না গো বাবু, টিয়ারঙের মদ্‌না।

নাম লিখে নিয়ে একটা চাকতি দিয়ে দিল নতুন ওভারসিয়ার।

অনেক আগে থেকে গিয়ে জাহাজে উঠে বসল মদ্‌না। মনে ভয়, যদি দেরি হয়ে যায়, যদি তাকে ফেলে রেখে জাহাজ চলে যায়।

তিল ধারণের জায়গা নেই জাহাজে। কিন্তু বেশির ভাগই নতুন লোক। চারিদিকে খুঁজল মদ্‌না। টিয়ারঙের কেউ যদি থাকে। এত লোক এসেছিল, কেউ বেঁচে নেই নাকি?

ফিরুজা? ফিরুজা কি বেঁচে আছে?

হঠাৎ কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল মদনা। কই, এত বছর কেটে গেছে, কোনোদিন তো মনে হয়নি এ-কথা। কোনোদিন ভয় হয়নি। আজ টিয়ারঙে ফিরে যাবার মুহূর্তে হঠাৎ ফিরুজা বেঁচে নেই মনে হল কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেলিং ধরে এসে দাঁড়াল মদনা।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে তখন। ধীরে ধীরে ঘোলা জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলে জাহাজ। গঙ্গার দুটো পাড় ক্রমশ দূরে সরে চলেছে।

ঘোলা জলের গঙ্গা। টিয়ারঙের সমুদ্র কখনো নীল, কখনো সবুজ। কিন্তু গঙ্গার জলে তেমন ঢেউ নেই, রঙও নেই।

টিয়ারঙের জীবনে কতবার সে আর ফিরুজা স্বপ্ন দেখেছে এই গঙ্গার, গঙ্গার দু-পাশের এই মাটির। কত গল্প শুনেছে গঞ্জমাঝিদের কাছে। এ-মাটি নাকি সোনা ফলায়, এ-জলে ঝাঁকে ঝাঁকে রুপোর ইলিশ ঝিকমিক করে। টিয়ারঙের জেলেদের মতো প্রাণ হাতে নিয়ে উন্মাদ সাগরের বুকে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

এই মাটিতে আসতে চেয়েছে সে আর ফিরুজা, কত কি কল্পনার জাল বুনেছে বান্নুকে ঘিরে, তার ছোট্ট মেয়েকে ঘিরে।

তারপর সত্যিই একদিন এই গঙ্গার জলে ডিঙি ভাসিয়েছে মদনা, এই মাটিতে ঘর বেঁধেছে, কিন্তু তার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। সব স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে, সব কল্পনা মিথ্যা হয়ে গেছে।

এমনিই বুঝি হয়। সমুদ্রের এপার থেকে মাটির মানুষও বুঝি

এমনি মিথ্যা স্বপ্নের মোহে দ্বীপের দিকে ছুটে যায়। দ্বীপের মানুষ ভাবে সমুদ্রের এপারে মাটির জগতে আছে সব সুখ ঐশ্বর্য।

সে ভুল ভেঙে গেছে মদ্‌নার।

জাহাজ এগিয়ে চলে ধীরগতিতে। ডেকের ওপাশে কুলি-কামিনদের চিৎকার হট্টগোল। স্টিফেন্স কোম্পানির উঁচুতলার বাবুদের জল্পনা-কল্পনা।

সব নতুন মানুষ। ওভারসিয়ার পাঠক নেই, অমিয়বাবু নেই, নতুনবাবু নেই, ছুটদিদি নেই। তবু সবাই যেন তার কত আপনজন। যেন কতকালের চেনা। এরা যে সকলেই চলেছে আজ টিয়ারঙে। মদ্‌নার সেই ছোট্ট দ্বীপটিতে, যেখানে আছে ফিরুজা আর তার ছোট্ট মেয়ে বান্নু।

ক্রমে ক্রমে দু-পাশের মাটি অদৃশ্য হয়ে যায়। দূরে সরে গেছে নদীর তীর। নদী নয়, নদীর মোহনা এসে পড়েছে সমুদ্রে। জলের রঙ ঈষৎ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। শান্ত ঘোলা জলে ধীরে ধীরে শান্ত ঢেউ এসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দূরে, যতদূরে চোখ যায়, অনিমেষ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে মদ্‌না। যেন কত কি ছবি দেখতে পাচ্ছে সে, কত আশা।

ক্রমশ সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসে। অন্ধকার আর তারার ঝিকিমিকি। সমুদ্রের মতো অসীম অন্ধকার। অন্ধকার সমুদ্রের বুকে একটা ক্ষিপ্ত চিতাবাঘের মতো গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলেছে স্টিফেন্স কোম্পানির জাহাজ।

আবার দপ্তর বসবে কোম্পানির। বসতি বসবে নির্জন টিয়ারঙ দ্বীপে। আগের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠবে কুলিকামিনদের বস্তি,

বাবুপাড়া, কোম্পানিমহল। সমুদ্রের বুকে পথহারা ডিঙির মতো ছোট্ট একটি দ্বীপ আবার জেগে উঠবে। কিন্তু সে-দ্বীপে থাকবে না টিয়ারঙের কোনো আদিম মানুষ।

শুধু মদ্না আর ফিরুজা, আর তার ছোট্ট মেয়ে।

এ-কথা মনে পড়তেই আপনা থেকেই বিষণ্ণ বোধ করে মদ্না। ফিরে এসেও কি তবে ফিরে পাবে না তার সেই পুরনো দিনের জীবন? এই টিয়ারঙের মাটি, বন, জল ছলছল নয়ানজুলি, টিয়ারঙের উদ্দাম সমুদ্র আর ডিঙি আর জাল, সবকিছুর স্বপ্ন দেখেছে সে, ভেবেছে, এই বাতাসে কত শান্তি, কত আনন্দ। ভেবেছে টিয়ারঙের মাটি আর জল বুঝি তার মনকে আকর্ষণ করেছে দিনের পর দিন।

জাহাজের রেলিং ধরে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বড়ো উদাস হয়ে গেল সে। না, মাটি নয়, জল নয়। মানুষ।

টিয়ারঙের সেই মানুষগুলোর টানেই সমুদ্র সুন্দর মনে হয়েছে তার।

নেই, সেই মানুষ নেই। টিয়ারঙের তাই রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই।

আছে। শুধু ফিরুজার জন্যে সব আছে, সব বেঁচে আছে আজও। ফিরুজা আর তার সেই ছোট্ট মেয়ের জন্যে।

ফিরুজার কথা মনে পড়তেই অধৈর্য হয়ে উঠল সে। স্থির হয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকাও যেন দুঃসহ।

অধীর উৎকণ্ঠায়, অন্তরের অস্থিরতায় ছুটে বেড়াতে চাইল।

রাত্রি ঘন হল, রাত্রি ফিকে হল।

তখনো অবিরাম ছন্দে বেজে চলেছে জাহাজের শব্দ। সমুদ্রের

ঢেউ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

ভোরের সূর্য ঠিকরে পড়ল নীল জলে।

দূরের দিগন্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল টিয়ারঙ দ্বীপ। সমুদ্রের বুকে ছোট্ট এক টুকরো মাটি। তেমনি সবুজের সমারোহ, তেমনি লাল ফুলের শিখা। ঠিক যেন একটি টিয়াপাখি বসে আছে।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল মদনা। অধৈর্য হয়ে উঠল।

বড়ো ধীরগতিতে চলেছে জাহাজটা। আরো দ্রুত গিয়ে পৌঁছতে পারলে যেন শান্তি পায় সে।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে টিয়ারঙ। স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেই জাহাজঘাটা।

তন্ন তন্ন করে সমুদ্রের পাড় খুঁজে বেড়ায় মদনা। উন্মাদ হয়ে ওঠে যেন। ফিরুজা? ফিরুজা কি নেই? বেঁচে নেই ফিরুজা?

এই নির্জন অরণ্যদ্বীপে ফিরুজা বোধহয় বেঁচে নেই। বেঁচে নেই।

তন্ন তন্ন করে তার দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় একটি আরণ্যক নারীকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সকলে। মদনাও চমকে ওঠে।

অবিরাম ছন্দে জাহাজঘাটার সেই পুরনো দিনের ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে।

বিস্ময়ের চোখে তাকায় মদনা।

সত্যিই সেই পুরনো দিনের সাবধানী ঘণ্টা, না স্মৃতির তারে অতীতের অনুরণন!

মাতাল ঢেউ ভেঙে পড়ছে দ্বীপের গায়ে, নীল ঢেউ ফেটে পড়ছে ফুলের মতো শাদা শাদা ফেনার রাশিতে। হয়তো ঘণ্টাধ্বনি নয়,

মাতাল ঢেউয়েরই শব্দ।

অনেক ধৈর্য ধরেছে মদনা, অনেক অপেক্ষা করেছে। আর নয়।

উন্মাদ হয়ে ওঠে সে। জাহাজঘাটায় এসে লেগেছে স্টিফেন্স কোম্পানির জাহাজ।

ভিড় ঠেলে ছুটে যেতে চায় মদনা।

বিস্ময়ের চোখে পাগল লোকটার দিকে তাকায় সকলে। পথ ছেড়ে দেয় উপহাসের হাসি হেসে।

ছুটে যায় মদনা।

গ্যাংওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

ফিরুজা? হাঁ, ফিরুজাই।

এক মনে জাহাজঘাটার ঘন্টিটা বাজিয়ে চলেছে ফিরুজা, কোনো-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

চিৎকার করে ডেকে ওঠে মদনা।—ফিরুজা! ফিরুজা!

তন্ময়তা ভাঙে না ফিরুজার। অবিরাম ছন্দে ঘন্টা বাজিয়ে চলেছে সে। মুখে তার তৃপ্তির হাসি।

—ফিরুজা! ফিরুজা!

চিৎকার করতে করতে সেদিকে এগিয়ে যায় মদনা।

তন্ময়তা ভেঙে যায় ফিরুজার। ফিরে তাকায়। একবার জাহাজটার দিকে, একবার মদনার দিকে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধানীর চোখে মদনার মুখের দিকে, তার সমস্ত শরীরের ওপর চোখ বুলিয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ যেন চিনতে পেরে সেও ছুটে আসে মদনার কাছে।

অস্ফুট কি একটা শব্দ বের হয় তার মুখ থেকে। তারপর ছুটে এসে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।

দুজনের চোখ বেয়েই অশ্রু ঝরে পড়ে। কান্না আর কান্না।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ কেটে যায়।

তারপর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ফিরুজা। দু-গাল বেয়ে অশ্রুর রেখা শুধু।

--ফিরুজা!

গভীর আবেশে কি যেন বলতে চায় মদনা।

আর অস্ফুট গোঙানির মতো একটা শব্দ বের হয় ফিরুজার মুখ থেকে। কি যেন বলতে চায় ফিরুজা, কি যেন বলতে চেয়েছে সে এই দীর্ঘ একাকিত্বের মাঝে। এই নির্জন দ্বীপের প্রতিটি নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কি যেন বলতে চেয়েছে সে।

হঠাৎ দু চোখ অশ্রুতে ফেটে পড়ে ফিরুজার। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। শুধু একটু অবোধ্য গোঙানির শব্দ বের হয়।

কথা বলতে চায় ফিরুজা, কথা বলতে পারে না।

এতদিনের নিঃসঙ্গ জীবনে কথা ভুলে গেছে ফিরুজা, কথা ভুলে গেছে।

শুধু কান্নাহাসির দুটি বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে মদনার মুখের দিকে।

বোবা হয়ে গেছে ফিরুজা। বোবা হয়ে গেছে টিয়ারঙ দ্বীপ। বোবা হয়ে গেছে সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ।

এমনিই বুঝি হয়। যুগের পর যুগ, সমুদ্রের ঢেউ কত কথা,

কত প্রেম, কত আশা, কত স্বপ্ন নিয়ে উদ্দাম উন্মাদনায় ছুটে আসে। ভেঙে পড়ে দ্বীপের মাটিতে। সবুজ রঙিন পাতা আর লাল ফুল হাতে নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে দ্বীপ, নিঃশব্দ নির্বাক। নীল ঢেউ এসে দেখে দ্বীপ তার বোবা হয়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু অশ্রু হয়ে ফেটে পড়ে ব্যর্থতার বেদনায়।

বন্দী দ্বীপ গুমরে মরে, সমুদ্রের ওপারেতে শান্তি দেখে যেন। মুক্তি পেতে চায়। নিঃসীম নীল জলে মুক্তি আছে অসহ্য বেদনার, তাই বুঝি বন্দী দ্বীপে ছুটে আসে উন্মাদ সাগর।